৭.১৩ মণিষা দ্বীপ – Bangla Library

৭.১৩ মণিষা দ্বীপ – Bangla Library

মণিষা দ্বীপ– ১১৩

চন্দনা কাগজের পুঁটলিখানা খুলে ফেলতেই দেখতে পেলো তার মধ্যে রয়েছে রাণীর সেই মহামূল্যবান পাথর মাণিকটি।

রাণীর চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

দুহাত দিয়ে রাণী তুলে নিলো পাথরখানা, তারপর আনন্দ উচ্ছ্বাসে গদগদ হয়ে তার দিকে চাইতেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো রাণী–তার হাতে সুতীক্ষ্ণধার ছোরা, ছোরাখানায় চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

ইন্দ্রনাথের শরীরেও রক্ত।

বললো রাণী– তুমি এ মাণিক কোথায় পেলে?

ইন্দ্রনাথ কোনো জবাব দিলো না, সে যেমন এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

রাণীর কয়েকজন অনুচর তাকে বাধা দিতে যাচ্ছিলো।

রাণী তাদেরকে ইংগিতে বাধা দিতে বারণ করলো।

ইন্দ্রনাথ পাশ কেটে চলে গেলো দৃষ্টির অন্তরালে।

রাণী চন্দনাকে লক্ষ্য করে বললো ইন্দ্রনাথ যা করেছে তার তুলনা হয় না। সত্যি ও ধন্যবাদ পাবার যোগ্য…

এমন সময় ভীমরাজ এসে রাণীকে কুর্ণিশ জানালো। ভীমরাজ দস্যুরাণীর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ অনুচর। দয়া–মায়া বলতে তার কিছু নেই। যেমন তার চেহারা তেমনি তার মন।

ভীমরাজ রাণীকে লক্ষ্য করে বললো–ওকে ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হলো রাণীজী?

বললো রাণী–ভীমরাজ, কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয় তা আমাকে বলে দিতে হবে না। যাও তুমি নিজের কাজ করোগে। ইন্দ্রনাথকে তোমরা বাধা দিও না। আমি নিজে তাকে অনুসরণ করবো দেখবো সে কোথায় যায়!

চন্দনা বললো, রাণী, তুমি তাকে অনুসরণ করবে?

হা! যাও ভীমরাজ, তোমার জায়গায় তুমি ফিরে যাও।

ভীমরাজ পুনরায় কুর্ণিশ জানিয়ে চলে গেলো।

চন্দনাকে বললো রাণী–যা চন্দনা, রুহী আর দুলকীকে নিয়ে আস্তানার বাইরে অপেক্ষা কর। আমি আসছি……চলে গেলো চন্দনা।

রাণী নিজের বিশ্রামগুহায় প্রবেশ করলো।

দ্রুত ড্রেস পরিবর্তন করে নিলো। কোমরের বেল্টে পিস্তল আর ছোরাখানা ভরে নিলো।

রাণী তার বিশ্রামগুহা থেকে বেরিয়ে আসতেই চলনা হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়ালো, ব্যস্তকণ্ঠে বললো–রাণী, ইন্দ্রনাথ একটা অশ্বপৃষ্ঠে চেপে উধাও হয়েছে। আমাদের অনুচরগণ অশ্বখুরের শব্দ শুনতে পেয়েছে……

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তবে কি ইন্দ্রনাথ আমাদের কোনো অশ্ব নিয়ে…..

তাও হতে পারে। আমাদের অনুচরগণ কি মরে ছিলো?

অশ্ব নিয়ে যেতে হলে আমাদের অশালা থেকেই তাকে অশ্ব নিতে হবে।

রাণী একটা শব্দ করলো–হুঁ! চল্ গিয়ে দেখি।

তুমি তো রণসাজে সজ্জিত হয়ে নিয়েছ।

তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ফিরে আয় চন্দনা। আমি অপেক্ষা করছি।

বেশ, তুমি অপেক্ষা করো রাণী, আমি এলাম বলে। চন্দনা চলে গেলো।

রাণী পায়চারী করতে লাগলো।

তার ভারী বুটের শব্দ জম্বুর পর্বতের গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনি জাগালো।

ভাবছে রাণী ইন্দ্রনাথের কথা।

অদ্ভুত এ তরুণ।

সবকিছু ওর বিস্ময়।

প্রতিটি কার্যকলাপে কেমন যেন নতুনত্বের ছাপ আছে। তবে কি সে সত্যি বনহুরের……

চন্দনা ফিরে আসে।

রাণীর চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

চন্দনা পা থেকে মাথা পর্যন্ত একনজরে তাকিয়ে বলে–চমৎকার। চল আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না।

রাণী, ওকে খুঁজে বের করা মুস্কিল হবে।

কারণ?

সে অশ্ব নিয়ে চলে গেছে।

আমার রুহীও কম নয়।

চলো।

দস্যুরাণী আর চন্দনা আস্তানার বাইরে চলে এলো।

দুলকী আর রুহী নিয়ে অপেক্ষা করছে দুজন অনুচর।

দস্যুরাণী রুহীর পিঠে চেপে বসতেই চন্দনা চেপে বসলো দুলকীর পিঠে।

রাণী লাগাম চেপে ধরতেই অশ্ব রুহী ছুটতে শুরু করলো।

দুলকীও চন্দনাকে নিয়ে রাণীকে অনুসরণ করলো।

জম্বুর পর্বতের পাদমূলে অশ্বপদ শব্দের প্রতিধ্বনি জাগলো।

রাণী এবং চন্দনার দেহে একই পোশাক।

জমকালো শিকারী ড্রেস।

পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ভারী বুট।

মাথায় জমকালো ক্যাপ।

ক্যাপের ফিতেটা চিবুকের নিচে এটে বাধা।

অশ্ব যত দ্রুত ছুটতে থাকুক না কেন ক্যাপ খসে পড়বে না।

রাণীর চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠেছে, যেমন করে থোক ইন্দ্রনাথকে খুঁজে বের করতেই হবে। নিশ্চয়ই সে সন্ন্যাসীকে হত্যা করে মাণিক উদ্ধার করে এনেছে। কোথায় সেই দুষ্ট সন্ন্যাসীর আবাসভূমি আর তার পরিচয়ই বা কি জানতে হবে। কিন্তু এত সহজে ইন্দ্রনাথকে কি পাওয়া যাবে? সে কোন্ পথে কোথা গেছে কে জানে।

দস্যুরাণী অশ্বগতিরোধ করে মাঝে মাঝে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলো।

চন্দনাও দাঁড়িয়ে পড়ছিলো তার অশ্ব নিয়ে।

হঠাৎ চন্দনা বলে উঠলো–রাণী, দূরে অশ্বখুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

রাণী কান পাতলো, সত্যিই অশ্ব পদশব্দ শোনা গেলো। রাণীর চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো, বললো সে–চন্দনা, তুই ঠিক বলেছিস, আমরা ইন্দ্রনাথের অশ্বের খুরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি চন্দনা, এই পথে এগুলে আমরা ইন্দ্রনাথের সন্ধান পাবো।

চলো রাণী।

এবার রাণী এবং চন্দনা তাদের অশ্ব ছুটিয়ে দিলো যেদিক থেকে অশ্বখুরের শব্দ শোনা যাচ্ছিলো সেইদিকে।

*

তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর।

কুটির জনশূন্য মনে হচ্ছে।

আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলো না বনহুর। বড় পিপাসা পেয়েছে, দীর্ঘ পথ সে তাজের পিঠে অতিক্রম করে এসে পৌঁছেছে এই সুদূর বনভূমিতে।

এক পাশে জম্বুর পর্বত অপর পাশে গভীর জঙ্গল।

বহু প্রান্তর, পাহাড়–পর্বত অতিক্রম করে তবেই না বনহুর এসে পৌঁছেছে। একটি ফুলের মত সুন্দর মুখ–নাম ওর হুমায়রা। সন্ন্যাসী বাবাজী, তারপর অশ্ব জাম্বু, তারই পরিচিত অশ্ব। নিশ্চয়ই জাম্বু যেখানে সেখানেই আছে জাভেদ। বনহুর কর্তব্য পালনে গিয়েছিলো আবার সে ফিরে এসেছে। জাভেদকে যতই দূরে সরিয়ে রাখতে চাক না কেন, পারবে না। বনহুরের অবচেতন মন হু হু করে কাঁদে ওর জন্য। তারই রক্তের প্রবাহ রয়েছে যে জাভেদের ধমনিতে!

সন্ন্যাসীর আস্তানায় এসে বনহুর দেখা পেয়েছিলো হুমায়রার, মেয়েটার চোখেমুখে দেখেছিলো বনহুর একটা করুণ প্রতিচ্ছবি। কি যেন হারিয়ে গেছে ওর যা সে পাবে না কোনোদিন। কিন্তু কি সে বস্তু যা তার এত প্রিয়। বনহুর নিজের মনের কাছে বার বার এ প্রশ্নের জবাব খুঁজেছিলো কিন্তু তা সে পায়নি।

বেশি করে ব্যথিত করেছিলো বনহুরকে হুমায়রার স্মৃতি। এ ছাড়াও জাম্বু তাকে আকর্ষণ করেছিলো, নির্জন বনে সে যখন জাম্বুকে দেখেছিলো তখন একটা আশার আলো উঁকি দিয়েছিলো তার মনে, হয়তো বা জাভেদকে সে খুঁজে পাবে সেখানে।

বনহুর যখন কান্দাইয়ে কিছু কাজে জড়িয়ে পড়েছিলো তখন জাম্বু সবার অলক্ষ্যে উধাও হয়েছিলো বনহুরের আস্তানা থেকে। অবশ্য বনহুর জাম্বুকে সাবধানে রাখতে পারেনি। কারণ জাম্বুর প্রতি নূরীর দৃষ্টি পড়লে তাকে কিছুতেই সামলানো যাবে না। তাই বনহুর রহমানকে বলেছিলো, আস্তানার গোপন কোনো জায়গায় জাম্বুকে রেখে দাও।

রহমান সর্দারের আদেশ পালন করেছিলো।

আস্তানার নিভৃত এক জায়গায় কিছু খাবার দিয়ে রেখে দিয়েছিলো জাম্বুকে।

কিন্তু একদিন দেখা গেলো জাম্বু নেই।

সবার অলক্ষ্যে জাম্বু নিখোঁজ হয়েছে।

কথাটা রহমান যখন জানলো তখন ভীষণ ভড়কে গেলো সে। সর্দারকে কি জবাব দেবে, কোন্ মুখে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু বনহুর কথাটা শোনার পর রহমানকে কোনো প্রশ্ন করেনি বা রাগান্বিত হয়নি। শুধু বলেছিলো, যে যাবে তাকে কিছুতেই ধরে রাখা যায় না রহমান। ও কোথায় গেছে আমি জানি……

সর্দার!

হাঁ রহমান। একটু থেমে বলেছিলো বনহুর, আমাকেও যেতে হবে সেখানে।

কিন্তু আপনি যে অসুস্থ! বলেছিলো রহমান।

বনহুর হেসে বলেছিলো, সামান্য ক্ষত, সেরে গেছে।

সর্দার, প্রচুর রক্তপাত হয়েছিলো আপনার দেহ থেকে।

অমন কত রক্তপাতই তো কতবার হয়েছে রহমান।

নূরী জানতে পারলে……

ওকে বলো না। শোন রহমান, তাজকে প্রস্তুত করো, আমি আজই রওয়ানা দেবো।

আপনি একা যাবেন?

হাঁ, আমি একাই যেতে চাই। যাও তাজকে প্রস্তুত করো।

রহমান বিষণ্ন মনে চলে গিয়েছিলো। যদিও তার মন চাইছিলো না সর্দারকে এমন অবস্থায় একা কোথাও যেতে দেয় তবু বাধ্য হয়ে তাকে যেতে দিতে হয়েছিলো সেদিন।

বনহুর অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়িয়ে তাকালো চারদিকে। কাউকে নজরে পড়ছে না, এমনকি জাম্বুও তার দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি, তবে কি জাম্বু ফিরে আসেনি এখানে? ভাবলো বনহুর।

এবার বনহুর কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করলো।

দরজায় পা রাখতেই চমকে উঠলো, মেঝের এক পাশে চীৎ হয়ে পড়ে আছে সন্ন্যাসী–বিকৃত মুখ, রক্তে জ জপ করছে সন্ন্যাসীর বুকের এক পাশ এবং মেঝের মাটি।

বনহুর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো সন্ন্যাসীর পাশে। হাঁটু গেড়ে বসলো সে, ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলো সুতীক্ষ্ণধার ছোরা দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং বেশ কিছুক্ষণ হলো তাকে হত্যা করা হয়েছে, কারণ রক্ত শুকিয়ে কালো রং ধারণ করেছে।

বনহুর বুঝতে পারে না এই হত্যার কারণ।

চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলতেই দেখলো বনহুর, একপাশে কিছুটা মেঝে খুঁড়ে গর্ত করা হয়েছে। গর্তের চারপাশে ছড়িয়ে আছে মাটিগুলো।

কেমন যেন সব রহস্যময় মনে হলো।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

কুটিরের মধ্যে ভালভাবে তন্নতন্ন করে দেখতে লাগলো। হঠাৎ বনহুরের কানে ভেসে এলো অশ্ব পদশব্দ। কান পেতে শুনলো বনহুর, শব্দটা ক্রমান্বয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

বনহুর কিছুক্ষণ কুটিরের মধ্যে অপেক্ষা করলো তারপর বেরিয়ে এলো কুটিরের বাইরে। ততক্ষণে অশ্বারোহী এসে পড়েছে কুটিরের আঙিনায়।

অশ্বারোহীর দিকে নজর পড়তেই ভীষণ চমকে উঠলো বনহুর। আপন মনেই বলে উঠলো–জাভেদ.....

জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে।

সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে।

ওর চাহনি দেখে মনে হলো সে বনহুরকে মোটেই চিনতে পারেনি। বনহুর দুপা এগিয়ে এসে ডাকলো–জাভেদ!

জাভেদ নিরুত্তর।

তার চোখেমুখে ক্রুদ্ধ ভাব ফুটে উঠেছে।

বনহুর তার চাহনির মধ্যে খুঁজে পেলো না কোনো পরিচিতির ভাব। তবে কি জাভেদ তাকে চিনতে পারেনি।

জাভেদ ঠিক তার পূর্বের মতই সবল সুন্দর বলিষ্ঠ আছে। কিন্তু তার চোখ দুটোর দৃষ্টি সম্পূর্ণ। পাল্টে গেছে। হিংস্র আর ভয়ংকর লাগছে তার চোখ দুটো।

বনহুর লক্ষ্য করলো জাভেদ তার কোমরের বেল্ট থেকে ধারালো ছোরাখানা খুলে নিচ্ছে।

জাম্বু ঠিক তার প্রভুর কাছে পৌঁছে গেছে তাহলে.....কিন্তু ভাববার সময় কই। এই মুহূর্তে জাভেদ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু মনে তার চরম বিস্ময়, জাভেদ তাকে আক্রমণ করছে। ওর চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে সে তাকে চিনতে পারেনি। হিংস্র বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো জাভেদ বনহুরের উপর।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর খপ করে ধরে ফেললো জাভেদের ছোরাসহ হাতখানা। খুব শক্ত করে চাপ দিতে লাগলো বনহুর জাভেদের হাতে কিন্তু আশ্চর্য, একটুও শিথিল করতে পারছে না সে জাভেদের হাতখানা। অবাক হলো বনহুর মনে মনে, কারণ তাকেও যেন হার মানাতে বসেছে জাভেদ। বিস্ময়কর শক্তির অধিকারী হয়েছে সে।

তবুও এক সময় বনহুরের কাছে হার মানলো জাভেদ। ছোরাখানা তুলে নিয়ে বনহুর জাভেদের বুকে বসিয়ে দেবার জন্য হাতখানা উদ্যত করার অভিনয় করলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে হুমায়রা ছুটে এসে চেপে ধরলো বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা, করুণ কণ্ঠে বললো–না না, ওকে তুমি হত্যা করো না। আমাকে হত্যা করো......

বনহুর তাকালো হুমায়রার মুখের দিকে।

একটা করুণ অসহায় মুখ।

দুচোখে মায়াময় চাহনি।

ছলমল করছে চোখ দুটো।

বনহুর দক্ষিণ হাতখানা নামিয়ে নিলো।

হুমায়রা বললো–ওকে আমি জীবনের চেয়ে বেশি ভালবাসি। তুমি ওর জীবনের বিনিময়ে আমার জীবন নাও তবু আমি দুঃখ পাবো না। ওকে তুমি হত্যা করো না……

বনহুর সব অনুধাবন করলো। সে এবার বুঝতে পারলো সন্ন্যাসীকে জাভেদই হত্যা করেছে।

জাভেদ এখানে আজ আসেনি অনেক দিনের পরিচয় ওদের মধ্যে তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু আশ্চর্য, জাভেদ তাকে চিনতে পারছে না কেন?

কি ভাবছো?

বনহুর তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললো–জানো ও তোমার সন্ন্যাসী বাবাকে খুন করেছে?

গভীর কণ্ঠে বললো হুমায়রা–জানি!

জানো! জেনেও তুমি ওকে ক্ষমা করছো? বললো বনহুর।

সন্ন্যাসী আমার বাবা হলেও সে বড় নিষ্ঠুর ছিলো। ওকে ইন্দ্রনাথ হত্যা করায় আমি খুশি হয়েছি।

ইন্দ্রনাথ! কে ইন্দ্রনাথ?

কেন যে তোমার সামনে দন্ডায়মান।

জাভেদ! জাভেদ ইন্দ্রনাথ!

তুমি জানো না তরুণী, ওর নাম ইন্দ্রনাথ নয়–জাভেদ।

জাভেদ দাঁতে দাঁত পিষে বললো–সব মিথ্যা কথা হুমায়রা, ও যা বলছে সব মিথ্যা কথা। আমার নাম কোনোদিন জাভেদ ছিলো না, আমি ইন্দ্রনাথ।

হুমায়রা বললো–তুমি বসো! তুমি আমার অতিথি। আমি ইন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে বলছি। এস ইন্দ্র, আমার সঙ্গে এসো।

ইন্দ্রনাথ এবার হুমায়রার পেছনে পেছনে বাধ্য শিশুর মত এগিয়ে গেলো।

বনহুর জাভেদের ছোরাখানা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাইরে।

তাকালো বনহুর হুমায়রার দিকে।

জাভেদ তার পেছনে এগিয়ে যাচ্ছে।

দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো ওরা।

বনহুর বসে পড়লো কুটিরের দাওয়ায়। তাজ একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অদূরে জাম্বু ঘাস চিবুচ্ছে।

তাজ জমকালো আর জাম্বু ফিকে খয়েরী।

ওদের দুজনের চেহারার মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য।

তাজ বলিষ্ঠ তেজী সুন্দর।

আর জাম্বুর চেহারা ভীষণ ভয়ংকর।

অশ্ব দুটির মধ্যে কোনো ভাব হবার সম্ভাবনা নেই, মিলও নেই ওদের। বনহুর কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো অশ্ব–দুটির দিকে, তারপর ওর চিন্তাধারা প্রবাহিত হলো অন্য দিকে। জাভেদ সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে, তার চেহারা এবং চালচলন পূর্বের মত নেই। জাভেদ তাকে চিনতে পারেনি বলে মনে হলো, কিন্তু কেন? ওর চোখ দুটো দেখে মনে হলো এ জাভেদ যেন সে জাভেদ নয়। হুমায়রা বললো ওর নাম ইন্দ্রনাথ……সব রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।

বনহুর ফিরে তাকালো কুটিরের দিকে। কুটিরের মধ্যে পড়ে রয়েছে সন্ন্যাসীর মৃতদেহ। তাকেও হত্যা করা হয়েছে, জাভেদেরই এ কাজ। কিন্তু কেন তাকে সে

হত্যা করলো? জাভেদ কি তাহলে পাগল বা উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে....

এমন সময় ফিরে আসে হুমায়রা। ওর কোচড়ে কিছু ফলমূল।

বনহুরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে বলে হুমায়রা–তুমি বড় ক্ষুধার্ত তাই তোমার জন্য ফল। এনেছি, খাও।

চোখ তুললো বনহুর, তাকালো হুমায়রার মুখের দিকে। একরাশ রজনী গন্ধার মত সুন্দর সে। কিছুক্ষণ নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো বনহুর ওর দিকে।

বললো হুমায়রা–কি দেখছো অমন করে?

তোমাকে।

আমাকে?

হা।

কিন্তু কেন?

ভারী সুন্দর তুমি!

তবু আমাকে ইন্দ্র পছন্দ করে না।

তাই নাকি?

হাঁ, ও সব সময় আমাকে অবহেলা করে।

বনহুর আনমনা হয়ে যায়, তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে নূরীর মুখখানা। একদিন নূরীর অভিযোগ ছিলো সে নাকি তাকে অবহেলা করতো। কতদিন নূরী চোখের পানিতে ভিজিয়ে দিতে তার হাত দুখানা। আজ হুমায়রার কণ্ঠে সেই বেদনার সুর...

হুমায়রা বলে–কি ভাবছো?

না, কিছু না।

এই নাও ফলগুলো খাও। হুমায়রা ফলগুলো কোচড় থেকে বনহুরের সামনে রাখলো।

বনহুর একটা ফল তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে বললো–তোমার ইন্দ্রনাথ কোথায়?

ও এখন ঝর্ণার পানিতে সাঁতার কাটছে।

আর তুমি সেই ফাঁকে চলে এসেছো আমার কাছে?

হাঁ, আমি জানি তুমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত তাই কিছু ফল নিয়ে এলাম।

তোমার বাবাকে ইন্দ্র হত্যা করেছে, তাই না?

হাঁ। কিন্তু……আমি একটুও দুঃখ পাইনি।

কারণ?

আমার বাবা বড় অসৎ ছিলো, বেঈমান ছিলো সে।

তার মানে?

সব বলবো তোমাকে, তার পূর্বে আমাকে একটু সাহায্য করবে?

বলো?

ফলগুলো আগে খেয়ে নাও।

আচ্ছা খাচ্ছি তুমি বলো? বনহুর কয়েকটা ফল খেলো।

এবার বললো হুমায়রা–বাবাকে ঐ কূপের মধ্যে ফেলে দিতে হবে। আমি পারবো তবে তুমি আমাকে সাহায্য করবে।

আচ্ছা আমি প্রস্তুত আছি।

এসো তবে আমার সঙ্গে।

হুমায়রা পা বাড়ালো কুটিরের দিকে।

বনহুর হুমায়রাকে অনুসরণ করলো।

সন্ন্যাসীর মৃতদেহটা বনহুর আর হুমায়রা বয়ে নিয়ে এলো কূপটার কাছে।

বললো বনহুর–হুমায়রা, তোমার বাবার মৃত্যুর কারণ আমাকে বলবে?

বলবো তবে এখন নয়। এসো বাবার মৃতদেহের সৎকার করি।

বনহুর আর হুমায়রা মিলে সন্ন্যাসীর লাশটা কুপের মধ্যে ফেলে দিলো। তারপর একটা বড় পাথর চাপা দিলে তারা কূপটার মুখে।

বড় হাঁপিয়ে পড়েছে হুমায়রা।

বনহুর বললো–তুমি আমাকে সাহায্য না করলেও আমি পারতাম পাথরখানা চাপা দিতে।

তুমি আমার জন্য মিছেমিছি ভাবছো। আমার মোটেই কষ্ট হয়নি। বললো হুমায়রা।

বনহুর বললো–তোমার ইন্দ্রনাথ যদি এসে পড়ে তাহলে আবার সে আমাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করবে।

কিন্তু সে সুযোগ আমি দেবো না তাকে।

কেমন করে তাকে তুমি ক্ষান্ত করবে হুমায়রা?

সব জানতে পারবে তুমি...তোমার কাছে আমার অনেক কিছু বলবার আছে।

ঠিক আমারও কিন্তু তাই। তোমাকে কিছু কথা আমি বলতে চাই যা বলা নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তবে এ মুহূর্তে নয়। তুমি যাও, ইন্দ্রনাথ কোথায় তাকে দেখো, সে হয়তো ঝর্ণার পানি থেকে উঠে পড়েছে।

তুমি যা বলছে তা অসম্ভব কিছু না, কারণ ও বড় খেয়ালী। আমি এখন যাচ্ছি ওর কাছে, তুমি যেন চলে যেও না, কেমন?

বেশ, তোমার অনুরোধ রাখতে চেষ্টা করবো। বললো বনহুর। চলে গেলো হুমায়রা।

বনহুরের কাছে সব রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। সন্ন্যাসীর হত্যা তাকে প্রথম হতবাক করেছে। তারপর জাভেদের বিস্ময়কর পরিবর্তন তাকে একেবারে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে জাভেদ তাকে মোটেই চিনতে পারেনি, ব্যাপারটা আরও আশ্চর্যজনক।

বনহুর যত ভাবছে ততই তার মনে জানার বাসনা বেশি করে উঁকি দিচ্ছে। নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে......

কিছু সময়ের মধ্যে ফিরে এলো জাভেদ আর হুমায়রা।

জাভেদের চোখেমুখে তখনও হিংস্র ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ভেজা চুল এলোমেলো বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে কপালের চারপাশে। দক্ষিণ হাতখানা ওর হুমায়রার হাতের মুঠায়। পাশের কুটিরে ওকে নিয়ে গেলো হুমায়রা।

যাবার সময় জাভেদ একবার বনহুরের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো।

বনহুর মৃদু হাসলো মাত্র।

সেদিন আর দেখা হলো না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো এক সময়।

হুমায়রা বেশ কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলো পাশের কুটির থেকে।

বনহুর তখন কুটিরের উঠানে পায়চারী করছিলো।

হুমায়রা বললো–আমি এখন নিশ্চিন্ত, কারণ ইন্দ্রকে ঘুম পাড়িয়ে তারপর এলাম।

বনহুর বললো–ও কি কচি থোকা তাই ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হয়?

সত্যি কচি খোকার চেয়েও বেশি অবুঝ। ওকে নিয়ে আমার ভাবনার অন্ত নেই। যাক সব। বলব তোমাকে। এসো আমি রান্না করি তুমি আমার পাশে থাকবে। এসো না আমার সঙ্গে...সত্যি তুমি বড় ভাল, যেমন দুঃসাহসী তেমনি শক্তিশালী।

ইন্দ্রকেও তুমি হারিয়ে দিয়েছে, উঃ! কি সর্বনাশটাই না হয়ে যেতো তোমার হোরাটা যদি বিদ্ধ হতে ওর বুকে। ভাগ্যিস আমি এসে পড়েছিলাম, নইলে......

যাক ওসব কথা, চলো তুমি যে বললে রান্না করবে?

হাঁ রান্না করবো!

তোমার বাবার জন্য আমি দুঃখ পাচ্ছি, কারণ সন্ন্যাসী বাবা ওবার আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছিলো।

কিন্তু তুমি তার আসল রূপ জানো না আর জানো না বলেই তুমি দুঃখ করছো। এসো, আমি রান্না করবো তুমি বসবে আমার পাশে। আমি তখন সব বলবো। ইন্দ্র এখন মোটেই জাগবে না, ওকে আমি ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছি......

ঘুমের ওষুধ!

হাঁ।

তুমি ওষুধ জানো?

জানি, কেন, তোমার ঘুম হয় না বুঝি?

না তা বলছি না, বলছি তুমি ওষুধ তৈরি করতে জানো?

বাবা আমাকে সব শিখিয়েছিলো।

সন্ন্যাসী বুঝি সব ওষুধ জানতো?

হাঁ, সব ওষুধ সে জানতো। বসো এখানে।

রান্নার আয়োজন করে নিচ্ছে হুমায়রা, সেই ফাঁকে একটা খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে দিলো সে বনহুরকে।

বনহুর আসন গ্রহণ করলো।

প্রদীপ জ্বেলে উনানের পাশে রেখে পিড়ি টেনে বসলো হুমায়রা।

উনানে আগুন জ্বাললো

আগুনের লালচে আলো এসে পড়ছে হুমায়রার মুখে।

বনহুরের মুখেও আলো পড়ে তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। বলিষ্ঠ মুখমন্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে গোলাপী আভা। প্রশস্ত ললাটে কয়েক গুচ্ছ চুল এলোমেলো লুটোপুটি খাচ্ছে। দীপ্ত উজ্জ্বল চোখ দুটো চকচক করছে আলোর ছটায়।

বললো হুমায়রা–ইন্দ্রের সঙ্গে তোমার চেহারার অনেক মিল রয়েছে।

বললো বনহুর–হয়তো হবে।

সত্যি আশ্চর্য হয়েছি, একজনের সঙ্গে এক জনের এত মিল কি করে হয়।

যাক ওসব কথা, তুমি না বলেছিলে রান্না করতে করতে সব বলবে?

হাঁ, শুনবে তুমি?

নিশ্চয়ই শুনবো, আর শুনবো বলেই তো এখানে এসে বসেছি। বলো তোমার কাহিনী? বনহুর খেজুর পাতার চাটাইটার ওপরে একটু নড়ে বসলো।

হুমায়রা উনানে আরও কিছু শুকনো কাঠ ঠেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসলো, বললো তোমার কোমরে বাধা অস্ত্রগুলো দেখে আমার খুব ভয় লাগে। ওগুলো তুমি সব সময় কেন সঙ্গে রাখো বলো তোর

প্রয়োজন হয় বলে।

এখানে আমি আর তুমি–আমার মনে হয় এখন ওগুলোর কোনো দরকার হবে না।

বেশ, আমি খুলে রাখছি। বনহুর কোমর থেকে অস্ত্রসহ বেল্টখানা খুলে রেখে দিলো ওপাশে।

বললো হুমায়রা–এখন তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে।

কেন?

তোমাকে দেখে ভয় পাবার কিছু নেই।

ও।

শোন এবার তোমাকে অনেক কথা বলবো।

বেশ বলো?

সত্যি বাবার কথা মনে হলে মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠছে। হাজার হলেও বাবা তো।

তা তো বটেই।

তোমাকে সব বলবো কিন্তু তুমি কোনো কথা কাউকে বলবে না তো?

না।

আমি তাহলে তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?

পারো।

শোন, হাঁ মন দিয়ে শুনবে–আমার রান্না শেষ হবে গল্পও শেষ হবে। সত্যি তোমাকে আজ পাশে পেয়ে বড় খুশি লাগছে।

কেন

ইন্দ্রকে আজও আমি বশে আনতে পারলাম না। ও বড় খেয়ালী। কোনো সময় চুপচাপ আমার পাশে বসে গল্প শুনবে না। শুধু অশ্ব নিয়ে ছুটবে, যখন যেদিকে মন চাইবে সেইদিকে।

হাসলো বনহুর। ওর কানে প্রতিধ্বনি হচ্ছে নূরীর কথাগুলো।

এমনি করে নূরীও বলতো তাকে।

কি ভাবছো?

কিছু না।

হাসলে কেন?

তোমার কথাগুলো ভারী মিষ্টি তাই।

ভাল লাগছে তোমার?

খুব।

সত্যি তুমি সুন্দর তাই সব তোমার ভাল লাগে।

এবার বলো?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো হুমায়রা–সন্ন্যাসী আমার বাবা নয়।

তবে!

সে একজন দুষ্ট যাদুকর জ্যোতিষী। ছোটবেলায় আমাকে ও ধরে আনে কোনো শহর বা গ্রাম থেকে। তারপর আমাকে ওষুধ খাইয়ে আমার সত্তাকে লুপ্ত করে দেয়, আমি ভুলে যাই আমার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব,..

তারপর? এতক্ষণ বনহুর গভীর মনোযোগ না দিয়ে হাল্কাভাবে শুনে যাচ্ছিলো, এবার সে একান্তভাবে মনোনিবেশ করলো। বললো–তুমি তোমার অস্তিত্ব বিস্মৃত হলে?

হাঁ, আমি কে আজও জানি না। জানি না আমার বাবা–মা কে! জানি না আমার শেষ কোথায়!…

বনহুর বললো–বলো তারপর?

তারপর সন্ন্যাসী বাবাকেই আমি আমার আপনজন বলে মনে করেছি। সেও আমাকে নিজ কন্যার মতই ভাবতো। তার চালচলনে আমি কোনোদিন তাকে অপর জন ভাবতে পারিনি। আমি দেখতাম সন্ন্যাসী বাবা কি সব ওষুধ তৈরি করতে। নানা গাছ–গাছড়া এবং শিকড় থেকে রস তৈরি করতো সে, তারপর গাছ–গাছড়ার রস এবং বিভিন্ন শিকড়ের রস একত্রে মিশিয়ে বিড়াল বা হরিণ

শিশুকে খাইয়ে দিতো। এর পর আমি যখন একটু বড় হলাম তখন আমাকে সন্ন্যাসী বাবা শিখিয়ে দিলো কেমন করে ওষুধ তৈরি করতে হয়।

তারপর?

আমি একদিন দক্ষ হয়ে গেলাম ওষুধ তৈরি ব্যাপারে। সন্ন্যাসী বাবা তখন আমার ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো। সব সময় কিসের সন্ধানে বনে বনে ঘুরে বেড়াতো, কখনও পাহাড়ে পর্বতে খুঁজে ফিরতে কোনো একটা মূল্যবান বস্তু। মাঝে মাঝে গণনা করতো মাটিতে আঁচর কেটে। প্রায়ই সন্ন্যাসী বাবা নিরুদ্দেশ হতো। একা একা হাঁপিয়ে পড়তাম আমি। বেশ কয়েক দিন পর ফিরে আসতো। একদিন আমি ঘরে কাজ করছি, সন্ন্যাসী বাবা উঠানে বসে গণনা করছিলো। এমন সময় অশ্ব পদশব্দ শোনা গেলো। আমি ভাবলাম কোনো শিকারী পথ ভুল করে অথবা পিপাসার্ত হয়ে এদিকে আসছে। এমন অনেক বার হয়েছে, তাই আমি বেশি ব্যস্ত না হয়ে নিজের কাজে মনোযোগী হলাম।

বনহুর গভীর মনোযোগ সহকারে শুনে যাচ্ছিলো।

হুমায়রা রান্না করছে আর বলে চলেছে।

বলছে সে– অশ্ব পদশব্দ আমাদের কুটিরের পাশে এসে থেমে গেলো। আমি সহসা বাইরে আসতাম না, কারণ সন্ন্যাসী বাবার নিষেধ ছিলো হঠাৎ যেন কারও সামনে এসে না পড়ি। জানি না কি উদ্দেশ্যে বাবা আমাকে এ ব্যাপারে বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বাবার গলা শুনলাম। বাবা ডাকলেন–হুমায়রা, এক গেলাস ঠান্ডা পানি নিয়ে এসো।

আমি বাবার নির্দেশ পালন করলাম।

এক গেলাস ঠান্ডা পানি কলসী থেকে ঢেলে নিয়ে হাজির হলাম বাবার সামনে। হঠাৎ নজরে পড়লো এক তরুণ দাঁড়িয়ে আছে, চোখেমুখে তার ক্লান্তির ছাপ। বিস্মিত হলাম তরুণের বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা দেখে, কারণ এমন চেহারার মানুষ আমি আজও দেখিনি।

লজ্জা পাচ্ছিলাম।

বাবা বললেন–ও আমাদের অতিথি, ওকে পানি পান করতে দাও।

হাত বাড়িয়ে পানির গেলাস এগিয়ে দিলাম।

ও পান করলো বিনা দ্বিধায়।

তারপর বাবা বললো–অতিথি বড় ক্লান্ত, ওকে বিশ্রাম করতে দাও। আমাকে ইংগিত করলো সেই ওষুধ ওকে পান করাতে। যদিও আমি চমকে উঠলাম তবু বাধ্য হলাম। মনে মনে শিউরেও উঠেছিলাম, কারণ আমি জানতাম ঐ ওষুধ কত মারাত্মক।

বনহুরের মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। দুটো কুঁচকে গেছে আপনা আপনি। বললাম–তুমি তাকে সেই ওষুধ পান করিয়েছিলে?

হাঁ, আমি বাধ্য হয়েছি তাকে ঐ ওষুধ পান করাতে। আর আমি না খাওয়ালেও সন্ন্যাসী বাবা খাইয়ে দিতে, কারণ ওকে তার প্রয়োজন ছিলো। হুমায়রা থামলো।

বনহুর বললো–কে সে তরুণ অতিথি? ঐ ইন্দ্রনাথ বুঝি?

হা তুমি ঠিক ধরেছে, সেই তরুণই হলো ইন্দ্রনাথ......

কথা শেষ হয় না, বনহুর অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো–উঃ! কি সর্বনাশই করেছো তোমরা

হুমায়রা বললো–তুমি ওকে চেনো?

হাঁ, গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর।

হুমায়রা অবাক চোখে তাকালো।

উনানের প্রজ্বলিত অগ্নির লালচে আলোতে হুমায়রার চোখ দুটো চকচক করে উঠলো।

বনহুর বুঝতে পারলো, সে ইন্দ্রনাথ মানে জাভেদকে চেনে বলায় বিস্ময়ে হুমায়রা স্তম্ভিত হয়েছে। হেসে বললো–চিনলেও সে আমাকে চিনতে পারেনি, কারণ তোমার সন্ন্যাসী বাবার ওষুধ তাকে স্বাভাবিক সংজ্ঞা থেকে বঞ্চিত করেছে।

হুমায়রা হঠাৎ বলে উঠলো–রান্না শেষ, এবার তোমাকে খেতে দিই?

কিন্তু তোমার কথা শেষ হয়নি হুমায়রা।

জানি তুমি আরও জানতে চাও।

হা।–ইন্দ্রনাথ তোমার সন্ন্যাসী বাবাকে এমন নির্দয়ভাবে কেন হত্যা করলো তা এখনও আমার জানা হয়নি।

বলবো, সব বলবো তোমাকে, কারণ আমি তোমাকে বিশ্বাস করে ফেলেছি। তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার হাসি আমার বড় ভাল লাগে।

তাই নাকি?

হাঁ। সত্যি তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে। মনে হয় সর্বক্ষণ তোমাকে দেখি। আচ্ছা তোমার বাবা বুঝি তোমার মত সুন্দর ছিলেন?

হয়তো হবে।

বড় সংক্ষেপে কথা বলো তুমি।

চলো খেতে দেবে যে বলেছিলে?

হাত মুখ ধোবে না? ঐ মরা লোকটার রক্ত তোমার হাতে লেগেছিলো, আমি লক্ষ্য করেছি।

তা সত্যি, হাতখানা পরিষ্কার করে নেওয়াই ভালো। বনহুর উঠে দাওয়ার পাশে এসে দাঁড়ালো।

হুমায়রা এক পাত্র পানি নিয়ে ওর হাতে ঢেলে দিলো।

হাত দুখানা ধোয়া শেষ হলে বললো হুমায়রা–এবার তুমি খেতে পারো। যখন খাবে তখন বাকিটুকু বলে ফেলবো।

ততক্ষণে ইন্দ্রনাথ জেগে উঠতে পারে। বললো বনহুর।

হুমায়রা নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বললো–সে মাঝ রাতের পূর্বে জাগবে না। তার খাবার আমি যত্ন করে রেখে দেবো, উঠলে খাওয়াবো। তুমি আরাম করে খাও। বড় খুশি লাগছে সন্ন্যাসী বাবা মরেছে……তবে দুঃখ যে হচ্ছে না তা নয়, অনেকদিন ওর কাছে ছিলাম কিনা তাই।

বনহুরের সম্মুখে খাবারের থালাটা এগিয়ে দিলো হুমায়রা। বনহুর খেতে শুরু করলো।

বনহুর বললো–তুমি খাবে না?

খাবো কিন্তু ওকে না খাইয়ে আমি খেতে পারি না, কারণ ও আমার চেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত। তুমি খাও।

বনহুর বেশ ক্ষুধার্ত ছিলো তাই সে বিনা দ্বিধায় খেতে শুরু করলো, কয়েক গ্রাস খাওয়ার পর হেসে বললো–আমার খাবারে তো ওষুধ মিশিয়ে দাওনি?

সন্ন্যাসী বাবা বলেছিলো সেদিন, যেদিন তুমি সেই মেয়েটিকে নিয়ে আমাদের কুটিরে প্রথম এসেছিলে। উঃ কি কষ্ট করেই না তোমাকে রক্ষা করেছিলাম।

সত্যি তুমি লক্ষ্মী মেয়ে। তোমার মত মেয়ে হয় না।

তুমি বেশি বাড়িয়ে বলছো। যাক শোনো তবে এবার। মনে রেখো, পেট পুরে তোমাকে খেতে হবে। জানো তো এখানে কোন বস্তু সহজে পাওয়া যায় না। বাবার সঙ্গে ঘুরে বন্দরে যেতাম, সেখান থেকে মাথায় বয়ে চাল–ডাল–প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র নিয়ে আসতাম। এখন অবশ্য আমার কষ্ট হবে, কারণ ইন্দ্র কিছু বুঝতে চায় না।

বনহুর বললো–তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

তার মানে?

আমি তোমাকে লোকালয়ে পৌঁছে দেবো।

উ হু আমি গেলে তো তুমি নিয়ে যাবে। যাক ও কথা, তোমার খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে, আমার বলাই–হলো না। প্রায়ই সন্ন্যাসী–বাৰা ইন্দ্রনাথকে নিয়ে বাইরে

কোথায় চলে যেতো, আমি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতাম। এক সময় ফিরে আসতো সন্ন্যাসী বাবা–আসতো ইন্দ্র। বড় ক্লান্ত লাগতো ইন্দ্রকে, চোখমুখ ওপর রক্তাভ হয়ে উঠতো, বড় মায়া লাগতো আমার। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারতাম না, সন্ন্যাসী বাবার কথা মনে করে চুপ থাকাটাই শ্রেয় মনে করতাম। সন্ন্যাসী বাবা কিসের সন্ধান করে ফিরতো আমি জানতাম না।

তারপর! বললো বনহুর।

হুমায়রা বললো–তারপর একদিন সন্ন্যাসী বাবা এবং ইন্দ্রনাথ কোথায় চলে গেলো আর তাদের খোঁজ–খবর পেলাম না। প্রতিদিন আমি ব্যাকূল আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকতাম পথের দিকে চেয়ে। দিন যেতো রাত আসতো কিন্তু ওরা আর ফিরে আসতো না। বড় অস্থির লাগতো, আমার। একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় গহন বনে অত্যন্ত অসহায় মনে হচ্ছিলো, এমন দিনে ফিরে এলো সন্ন্যাসী বাবা।

কতদিন পর সে ফিরে এলো?

বেশ কিছুদিন পর সে একা ফিরে এলো। তার সঙ্গে ইন্দ্রনাথ নেই। কেমন যেন ভয়ংকর লাগছে সন্ন্যাসী বাবাকে। চোখেমুখে তার আনন্দোচ্ছাস। একটা পুটলি ছিলো তার সঙ্গে। পুটলিটা সন্ন্যাসী বাবা মজবুত করে বগলে চেপে ধরে আছে। আমি তো তাকে দেখে অবাক হলাম, কারণ তাকে স্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো না এবং তার সঙ্গে যখন ইন্দ্রনাথকে দেখলাম না তখন একটা সন্দেহ আমার মনকে বিচলিত করে তুললো।

বনহুরের খাওয়া হয়ে এসেছিলো, সে হাত–মুখ ধুয়ে ঠিক হয়ে বসলো। বলে চলেছে। হুমায়রা–আমি সন্ন্যাসী বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইন্দ্র কোথায়? বললো সন্ন্যাসী বাবা, তার কথা জানি না, সময় হলে আসবে। তারপর সন্ন্যাসী বাবা কুটিরে প্রবেশ করলো, দরজায় খিল এঁটে কি করলো সেই জানে।

তারপর?

সন্ন্যাসী বাবা যখন কুটির থেকে বেরিয়ে এলো তখন তাকে বেশ হাসিখুশি মনে হচ্ছিলো। বড় প্রফুল্ল লাগছিলো তাকে। এরপর বেশ কিছু দিন কেটে গেলো ইন্দ্র আর ফিরে এলো না। আমার মনটা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো, আমি ভাবলাম ইন্দ্র আর জীবিত নেই। জীবিত থাকলে সে নিশ্চয়ই এতদিনে ফিরে আসতো। তারপর

আমি ধীরে ধীরে মুষড়ে পড়লাম, ইন্দ্রকে আমি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসতাম কিনা, তাই।

থামলো হুমায়রা।

বনহুর বললো–ইন্দ্রনাথ ফিরে এলো কখন?

বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন ইন্দ্রনাথ এসে হাজির হলো। তার চেহারাও স্বাভাবিক ছিলো না। কেমন যেন উদভ্রান্ত এবং হিংস্র লাগছিলো তাকে। ইন্দ্রনাথ জীবিত আছে দেখতে পেয়ে আমি আনন্দে অধীর হয়ে পড়লাম কিন্তু সে আমার দিকে মোটেই লক্ষ্য করলো না। হঠাৎ সে কুটিরের চালায় গুঁজে রাখা ছোরাখানা হাতে নিয়ে কুটিরে প্রবেশ করলো।

সন্ন্যাসী তখন কোথায় ছিলোর বনহুর প্রশ্ন করলো হুমায়রাকে।

হুমায়রা চোখ দুটো তুলে ধরলো বনহুরের মুখের দিকে। কথাটা বলতে যেন বুকটা কেঁপে উঠলো তার তবু সে বললো– সন্ন্যাসী বাবা ঘরেই ছিলো। ইন্দ্রনাথ ছোরাখানা হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো। আমি শিউরে উঠলাম একটা ভয়ংকর অবস্থার জন্য, সত্যি বলতে কি আমি ঠিক সন্দেহ করে ফেললাম সন্ন্যাসী বাবাকে ইন্দ্র হত্যা না করে ছাড়বে না। একটু পরে যখন ইন্দ্র রক্তাক্ত ছোরাসহ বেরিয়ে এলো তখন আমার সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়েছে বুঝতে পারলাম। বুকটা আমার কেঁপে উঠলো, একটা যন্ত্রণাও অনুভব করলাম মনে, কারণ সন্ন্যাসী বাবা আমাকে স্নেহ করতো। তার জন্য মনটা আমার খারাপ হয়ে গেলো……একটু থেমে বললো হুমায়রা, আমার কথা শেষ হয়েছে, এরপর যে দৃশ্য তুমি দেখলে তা তোমাকে নতুন করে বলতে হবে না।

বনহুর একটা শব্দ করলো–হু।

কি যেন গভীরভাবে ভাবতে লাগলো সে। সন্ন্যাসী যে একটা যাদুকর ছিলো তাতে কোনো ভুল নেই এবং সেই সন্ন্যাসী জাভেদকে কোনো ওষুধ খাইয়ে তার স্বাভাবিক জ্ঞান বিলুপ্ত করেছে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই, হুমায়রার কথা থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

হঠাৎ কোনো কথা মনে হওয়ায় হুমায়রা বলে উঠলো–তুমি বলবে না কাউকে, আমার বারণ রইলো। জানো, সন্ন্যাসী বাবা কোনো একটা বস্তু এনে কুটিরের

একেকোণে পুঁতে রেখেছিলো যা তার মুখে হাসি ফুটিয়ে ছিলো এবং যা সে খুঁজে বেড়াতো দীর্ঘকাল ধরে।

ভ্রুকুঁচকে গেলো বনহুরের, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে ধরলো বনহুর হুমায়রার মুখের দিকে।

হুমায়রা বললো–আমি জানি, মহামূল্যবান কোনো বস্তু সন্ন্যাসী বাবা পেয়েছিলো এবং ইন্দ্রনাথ ঐ বস্তু সম্বন্ধে জানতো। আর জানতো বলেই ইন্দ্রনাথ সোজাসুজি ধারালো অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করেছিলো কুটিরে....একটু থামলো হুমায়রা, তারপর পুনরায় বললো–সন্ন্যাসী বাবাকে হত্যা করে ইন্দ্রনাথ সেই মহামূল্যবান বস্তুটা হস্তগত করেছিলো।

তারপর হুমায়রা, তারপর?

সেই মহামূল্যবান বস্তুটা ইন্দ্রনাথ হস্তগত করলেও সে তা গ্রহণ করেনি। ওটা নিয়ে সে বেরিয়ে গিয়েছিলো সেই মুহূর্তে, তারপর যখন সে ফিরে এলো তখন সে শূন্যহস্তে ফিরে এসেছে।

বনহুর গভীর মনোযোগ সহকারে শুনলো হুমায়রার কথাগুলো।

হুমায়রা যা বললো সব সত্য এবং রহস্যময়। কি সে বস্তু যা সন্ন্যাসী জ্যোতিষীকে এত আকৃষ্ট করেছিলো এবং তা সে হস্তগত করেছিলো যে কোনো উপায়ে। ইন্দ্রনাথ মানে জাভেদ সেই বস্তুটা সন্ন্যাসীকে হত্যা করে উদ্ধার করে এবং তা সে কি করেছে জানে না হুমায়রা......কিন্তু কি সে বস্তু আর বস্তুটি কিই বা করলো জাভেদ...

কি ভাবছো? বললো হুমায়রা।

বনহুর একটু হেসে বললো–ভাবছি সব কিছু রহস্যময়।

হাঁ, রহস্যময়ই বটে। হুমায়রা উদাস কণ্ঠে কথাটা বললো। তারপর বললো–চলো, তোমার শোবার ব্যবস্থা করে দিই।

চলো। উঠে পড়লো বনহুর।

পাশের কুটিরে খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে বনহুরকে শুতে দিলো হুমায়রা।

বনহুর হাতের ওপরে মাথা রেখে চীৎ হয়ে শুয়ে পড়লো।

হুমায়রা বললো–আমি বসবো তোমার পাশে?

বললো বনহুর–না, আমি এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বো। তুমি যাও হুমায়রা।

কিন্তু ইন্দ্র যে এখনও উঠলো না। ও না খেলে আমি ঘুমাতে পারবো না। সত্যি ও বড় ক্ষুধার্ত ছিলো। আমি বরং তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেই।

হুমায়রার সরলতা বনহুরকে বিমুগ্ধ করলো। পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করলো বনহুর।

গভীর রাত হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো বনহুরের। দেখতে পেলো হুমায়রা শক্ত করে ধরে রেখেছে জাভেদকে, তার দক্ষিণ হাতে সুতীক্ষ্ণধার ছোরা। বনহুর মুহূর্তে সব বুঝে নিলো–জাভেদ তাকে হত্যা করতে এসেছিলো কিন্তু হুমায়রা বাধা দিয়েছে তাই সে মৃত্যু থেকে রেহাই পেলো।

বনহুর শয্যায় উঠে বসলো।

হুমায়রা এবার ছেড়ে দিলো জাভেদকে।

অসহায় চোখে তাকালো হুমায়রা বনহুরের দিকে।

বনহুর একটু হেসে বললো–আমাকে হত্যা করে তোমার লাভ?

জাভেদ দৃঢ় গলায় বললো–জানি তুমি শত্রু। তাই শত্রুকে হত্যা করাই আমার কাজ।

তুমি ভুল করছে, কারণ আমি তোমার শত্রু নই।

তুমি কি বলতে চাও তুমি আমার বন্ধু বা আমার হিতাকাক্ষী

হাঁ হাঁ, আমি তোমার হিতাকাক্ষী। বললো বনহুর।

জাভেদের চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো সে–তোমার জীবনলীলা আমি সাঙ্গ করে দিতাম শুধু ওর জন্য তুমি বেঁচে গেলে।

সেজন্য আমি হুমায়রার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কথাটা বলে বনহুর উঠে দাঁড়ালো শয্যা ত্যাগ করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে জাভেদ ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের ওপর, যেমন করে হিংস্র বাঘ শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এবার বনহুর কুদ্ধ সিংহের মত ফুলে উঠলো। জাভেদ ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ছোরাসহ হাতখানা ধরে ফেললো শক্ত করে এবং বাম হাতে একটি ঘুষি বসিয়ে দিলো তার পেটের একপাশে।

জাভেদ বনহুরের প্রচন্ড ঘুষি সহ্য করতে পারলো না, পড়ে গেলো। তার হাতের ছোরাটা ছিটকে পড়লো দূরে।

বনহুর পা দিয়ে ছোরাটা আরও দূরে সরিয়ে দিলো। তারপর জাভেদকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো–জাভেদ, তুমি নিজেকে ভুলে গেছো, তাই এখনও সম্বিৎহারা হয়ে আছে।

তাকালো জাভেদ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বললো–তুমি ইন্দ্রনাথ নও জাভেদ...

ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালো জাভেদ বনহুরের চোখ দুটির দিকে মাথাটা ধীরে ধীরে নিচু হয়ে এলো তার।

বনহুর বললো–যাও ঘুমাবে যাও।

জাভেদ রাগতভাবে বেরিয়ে গেলো।

হুমায়রা তাকে অনুসরণ করলো।

*

দস্যুরাণীর চোখে কালো চশমা।

অশ্বের লাগাম চেপে ধরে তাকালো সে সামনে।

চন্দনা বললো–রাণী, সামনে একটা কুটির নজরে পড়ছে।

হাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি এই গহন বনে কুটির–নিশ্চয়ই লোক বসবাস করে বলে মনে হচ্ছে। চল দেখা যাক।

আচ্ছা রাণী, ইন্দ্রনাথকে খুঁজে লাভ কি? আমাদের হারানো বস্তু যখন পাওয়া গেছে তখন……

কথা শেষ হয় না চন্দনার।

একটা শক্ত রশি এসে বেষ্টন করে ফেলে রাণীর দেহটা। পরক্ষণেই চন্দনার দেহেও ফাস পড়ে যায়।

রাণী এবং চন্দনা ভাবতে পারেনি তাদের অবস্থা এমন হবে। কে বা কারা তাদের দুজনকে এভাবে বন্দী করে ফেললো। রাণী নিজের কোমর থেকে ছোরাখানা খুলে নিয়ে রশি কেটে ফেলার চেষ্টা করলো কিন্তু এমনভাবে রশি তাদের দেহ বেষ্টন করেছে যে একচুল নড়বার উপায় নেই।

চন্দনাও রাণীর মত চেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু কৃতকার্য হচ্ছে না। ক্রমে আরও বেশি জড়িয়ে পড়লো। তারা রশির আবেষ্টনীতে।

একটু পরই তারা বুঝতে পারলো রশিগুলো কোথা থেকে এসেছে। কয়েকজন ইংরেজ বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে। চোখেমুখে তাদের চক্রান্তমূলক হাসির আভাস। বললো একজন–শিকার ভুল হয়েছে, তবে যা হামরা পাইয়াছে তাহা ভুল নহে….

অপর একজন ইংরেজ বললো–বহুট খুবসুরৎ লারকী পেয়ারী হোবে…

অপর দুজন জোর করে নামিয়ে নিলো রাণী আর চন্দনাকে।

আরও দুজন ইংরেজ বন্দী হরিণীর মত শৃংখলাবদ্ধ করলো রাণী ও চন্দনাকে। তারপর তারা রশি খুলে নিলো ওদের দেহ থেকে।

রাণী ভাবতেও পারেনি তাদের এ অবস্থায় পড়তে হবে। তারা এসেছে ইন্দ্রনাথের সন্ধানে। এই নির্জন গহন বনে হিংস্র জীবজন্তু ছাড়া আর কেউ থাকতে পারে ভাবতে পারেনি তারা। ইংরেজদের প্রতি বিরূপ ছিলো রাণী তবে তারা এভাবে তাদের ফাঁদে ফেলবে তা ভাবেনি কোনোদিন।

ইংরেজগণ এ বনে এসেছিলো হিংস্র জীবজন্তু ধরবার জন্য। ওদের নানা ধরনের ফাঁদ, জাদরেল বাক্স যা দিয়ে হাতি পর্যন্ত ধরা যায়। রাণী আর চন্দনাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো। তারপর নিয়ে এলো বড় সাহেবের কাছে। অদূরে তাবু গেড়ে বড় সাহেব অপেক্ষা করছিলো।

আজই তাদের জাহাজ নোঙ্গর করেছে।

প্রথম দিন শিকারে নেমেই যা তারা শিকার করেছে তা মহামূল্যবান বস্তু। যদিও হিংস্র জন্তু বা বিস্ময়কর বস্তু নয় তবু তারা যে জীব এ মুহূর্তে পাকড়াও করেছে তা হিংস্র জীবজন্তু থেকে কম নয়।

ইংরেজগণ রাণী আর চন্দনাকে নিয়ে তাঁবুতে এসে হাজির হলো।

শক্ত মজবুত রশি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা রাণী আর চন্দনার হাত দুখানা। কোমরে শিকল বাঁধা।

তাঁবুর মধ্যে ওরা নিয়ে এলো রাণীকে।

একটা উঁচু স্থানে বসে ছিলো এক ইংরেজ। সে দলপতি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দলপতি বা বড় সাহেব তার শিকারী সহচরদের সঙ্গে দুজন অদ্ভুত পোশাক পরা মহিলা দেখে দুচোখে বিস্ময় নিয়ে বললো–ইহা কি রকম শিকার? এই জঙ্গলে কি মানুষ–ভূত আছে।

অপর ইংরেজ বললো–স্যার, ইহারা ভূত নহে। মানুষ–মেয়ে মানুষ।

বহুৎ খুবসুরাৎ কিন্তু এরা এই জঙ্গলে আসিল কি করিয়া? বড় সাহেব উঠে এগিয়ে এলো। তারপর রাণী আর চন্দনাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখে

বললো–এই মানুষ শিকার করিয়া হামরা বহুৎ খুশি হইয়াছি। ইহাদের পাইলে বহুৎ ভাল হইবে।

স্যার, ইহাদের কোটা রাখিবো? বললো অনুচরদের একজন।

দলপতি বললো–হামাদের জাহাজে লইয়া যাও। বহুট আচ্ছা করিয়া আটক রাখো যাহাটে পলাইটে না পারে।

বহুট আচ্ছা স্যার! বলে ইংরেজ অনুচরগণ দস্যুরাণী আর চন্দনাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

এমনভাবে চন্দনা আর রাণীকে ওরা ঘেরাও করে নিয়ে চললো যেন কোনো রকমে তারা পালাতে না পারে।

রাণী আর চন্দনা দৃষ্টি বিনিময় করলো কিন্তু তারা কোনো কথা বলতে পারলো না। কারণ তাদের চারদিক ঘিরে রয়েছে অনেকগুলো ইংরেজ, তাদের চোখেমুখে শার্দুলের লালসা।

হিংস্র জন্তুর চেয়ে এরা ভয়ংকর জানে রাণী।

শিশুবেলার কথা আজ তার মনে পড়ে গেলো। তার বাবা–মার সঙ্গে সে যখন জাহাজে স্বদেশে ফিরছিলো তখন তাদের জাহাজে জলদস্যুর হামলা হয়। জাহাজের প্রায় সবগুলো লোককে জলদস্যুরা হত্যা করে তাদের সবকিছু লুটে নিয়েছিলো। সেই সঙ্গে তার বাবা–মাও নিহত হয়েছিলো এবং কচি শিশু তখন রাণী তাকে নিয়ে গিয়েছিলো জলদস্যুদের সর্দার। সর্দার তাকে নিজ কন্যার মত লালন পালন করেছে কিন্তু রাণীর মন কোনোদিন সেই স্নেহের আবেষ্টনীতে আকৃষ্ট হয়নি, কারণ তার বাবা–মা ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের। তার ধমনিতে সেই রক্তের প্রবাহ আর জলদস্যু সর্দার ছিলো ইংরেজ। কত হৃদয়হীন আর পাষন্ড ছিলো তারা....

সেই থেকে ভীষণ একটা বিদ্রোহ ভাব রাণীর মনে দানা বেঁধে উঠেছিলো, তাই সে ইংরেজ জাতিকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি।

এই ইংরেজরা নানাভাবে ব্যবসা করে থাকে। সাধুতার মুখোশ পরে কখনও সাধু সাজে, কখনও নির্মমতার কঠিন নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত করে নিরীহ মানুষকে।

তবে বেশির ভাগ ইংরেজই যে এরকম তা নয়, তাদের মধ্যেও আছে মহপ্রাণ মানুষ। তবে যারা অসৎ ব্যবসায়ী তারা বড় হৃদয়হীন, রাণীর জীবনে তার প্রমাণ তার বাবা জলদস্যু রবার্ড কিং। জলদস্যু রবার্ড কিং–এর কথা স্মরন হলে আজও রাণীর মন বিষিয়ে ওঠে ঘৃণায়। দস্যুতা সে শিখেছিলো জলদস্যু পিতার কাছে, যার জন্য আজ সে লোকসমাজের অন্তরালে……

রাণী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো।

হঠাৎ তার শৃঙ্খলাবদ্ধ হাতে হেঁচকা টান পড়লো।

ইংরেজরা তার শিকল ধরে জোরে টান মেরে বললো–তুমি কি ভাবিটেছে জলদি আইসো।

চন্দনা বললো–রাণী, না জানি ভাগ্যে কি আছে! কোথায় তোমার ইন্দ্রনাথ আর….

চন্দনার কথা শেষ হয় না, হঠাৎ পাশের উঁচু টিলার ওপর থেকে কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো ইংরেজ শিকারীদের ওপর।

রাণী আর চন্দনা বিস্ময় নিয়ে দেখালো জমকালো পোশাক পরা একটা লোক ইংরেজ দুষ্কৃতিকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের প্রচন্ড এক এক ঘুষিতে ধরাশায়ী করে চলেছে।

কিছুক্ষণেই ইংরেজ অনুচরগণ জমকালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তির কাছে পরাজিত হলো। যদিও ইংরেজ অনুচরদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিলো তবু তারা সুযোগ পেলো না অস্ত্র ধরতে।

ইংরেজ অনুচরগণ পালাতে বাধ্য হলো।

দস্যুরাণী আর চন্দনা মুক্তিলাভ করলো।

জমকালো পোশাক পরা লোকটা এবার রাণী আর চন্দনার সম্মুখে এসে মুখের কালো রুমাল খুলে ফেললো।

রাণী আর চন্দনা অবাক হয়ে দেখলো জমকালো পোশাক পরা লোক অন্য কেউ নয়–স্বয়ং দস্যু বনহুর!

বললো রাণী–তুমি!

হাঁ আমি। দূর থেকে দেখলাম গুটিকয়েক ইংরেজ দুজন বন্দীকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি আমার অশ্ব নিয়ে ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে এগিয়ে এলাম এবং টিলার ওপরে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম ওরা তোমাকে আর তোমার সঙ্গিনীকে নির্মমভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে আক্রমণ চালালাম। রাণী, তোমাদের এ অবস্থা কেন?

চলো বনহুর আমার আস্তানায় চলো, সব বলবো।

চন্দনাও বলে উঠলো–আপনি আমাদের যেভাবে বাঁচিয়ে নিলেন তা আমাদের ভাগ্য বলতে হবে। চলুন রাণী যা বলছে তাই করুন।

রাণী বললো–আমি নিজেও ভেবে পাচ্ছি না কি করে তোমার আবির্ভাব ঘটলো!

বনহুর বললো–সে অনেক কথা। রাণী, তোমার আস্তানা এ গহন বনে তা তো জানতাম না।

বনে নয়, পর্বতের অভ্যন্তরে। বললো রাণী।

বনহুর রাণী আর চন্দনাসহ এগিয়ে চললো।

বললো রাণী–আমাদের অশ্ব দুটি ইংরেজগণ আটক করেছে।

তোমরা তাহলে অশ্বযোগে বন ভ্রমণ করছিলে?

ঠিক তা নয়, একজনের সন্ধানে। বললো চন্দনা।

রাণী হঠাৎ বলে উঠলো–ঐ দেখ্ চন্দনা, আমাদের রুহী আর দুলকী..

তাইতো! ওরা তাহলে রুহী আর দুলকীকে ছেড়ে দিয়েছে। বললো চন্দনা।

রাণী আর চন্দনাকে দেখে রুহী আর দুলকী এগিয়ে এলো।

বনহুর শিষ দিলো।

রাণী আর চন্দনা অবাক হয়ে দেখলো টিলার ওপর থেকে দ্রুত নেমে আসছে একটা জমকালো অশ্ব।

বনহুর মৃদু হেসে বললো–তাজ!

ততক্ষণে দুলকী আর রুহী এসে দাঁড়িয়েছে।

বললো রাণী–সত্যি তুমি ভাগ্যবান বনহুর–এমন একটা অশ্ব তোমার বাহন।

হাঁ রাণী, তাজ আমার গর্ব। বললো বনহুর।

এবার বনহুর, রাণী আর চন্দনা নিজ নিজ অশ্বে চেপে বসলো।

ফিরে এলো ওরা রাণীর জম্বুর পর্বতের আস্তানায়। বিস্মিত হলো বনহুর, রাণীর আস্তানা বিস্ময়কর বটে। রাণীর আস্তানায় প্রবেশ করে বলে বনহুর–রাণী, তোমার দুঃসাহস আমাকে স্তম্ভিত করেছে।

কারণ? বললো রাণী।

দস্যু বনহুরকে যদি কেউ সহজে তার আস্তানার পথ দেখায় বা বলে তাকে আমি দুঃসাহসীই বলবো।

হঠাৎ রাণী হেসে উঠলো খিল খিল করে।

অবাক হয়ে বললো বনহুর–তোমার হাসির অর্থ বুঝলাম না রাণী?

রাণী একটা আসন বনহুরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো–বস সব বলছি।

বনহুর আসন গ্রহণ করলো।

রাণীও আর একটা আসনে বসে চন্দনাকে বললো–যা, মেহমানের জন্য নাস্তার আয়োজন করগে।

বুঝতে পারলো চন্দনা তাকে রাণী চলে যাবার জন্য ইংগিত করলো।

বললো বনহুর–এতক্ষণ ইংরেজদের জাহাজের খুপড়ি হতো তোমাদের আবাসস্থল।

অবশ্য তুমি মিথ্যা বলোনি বনহুর, এ জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তবে এ রকম বিপদে আমিও তোমাকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে বলে আশা করি। যাক ওসব কথা, শোনো বনহুর, তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

বনহুর নিশ্চুপ শুনে যেতে লাগলো।

রাণী বলে যাচ্ছে–যে মহামূল্যবান সম্পদ তুমি আমাকে সমুদ্রের তলদেশ থেকে উদ্ধার করে দিয়েছিলে সেই সম্পদ আমি হারিয়ে ফেলে ছিলাম।

বলো কি রাণী!

হাঁ বনহুর, আবার পেয়েছি।

বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে রাণীর মুখমন্ডল লক্ষ্য করছে। কারণ যে সম্পদ বনহুর দুর্গম স্থান থেকে উদ্ধার করে দিয়েছিলো তা সামান্য বস্তু নয়।

বলে চললো রাণী– সেই মহামূল্যবান সম্পদটা আমার হস্তগত হবার পর আমি সেটা এক গোপন স্থানে রেখেছিলাম।

তারপর?

এক সন্ন্যাসী এক তরুণসহ একদিন সেই গোপন স্থানে গিয়ে হাজির।

বলল কি রাণী!

হাঁ যা বলছি সব সত্যি। সন্ন্যাসী ও তরুণ আমার অনুচরদের হাতে বন্দী হয়ে আমার সামনে এলো। প্রথমেই তরুণকে দেখে আমি চমকে উঠলাম, কারণ তার চেহারার সঙ্গে তোমার চেহারার মিল দেখলাম।

বনহুরের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। গভীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো সে রাণীর চোখ দুটির দিকে।

রাণী বলে চললো–শুধুমাত্র তরুণটার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সন্ন্যাসী আর তরুণকে মৃত্যুদন্ড না দিয়ে বন্দী করে রাখার নির্দেশ দিলাম। যদিও আমি বুঝলাম আমার এ গোপন আস্তানায় প্রবেশ করার অপরাধ ক্ষমা করা চলে না। অবশ্য আমার অনুচরগণও অবাক না হয়ে পারেনি। কারণ এমন ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি।

তারপর?

আমি তরুণের প্রতি সদয় হওয়ায় এমন একটা ঘটনা ঘটে গেলো যার জন্য আমি আমার অনুচরদের নিকটে লজ্জিত হলাম,

রাণী সমস্ত ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বনহুরের কাছে বলে গেলো। সন্ন্যাসী আর তরুণ সম্বন্ধে বনহুরের কোনো সন্দেহ রইলো না। সন্ন্যাসীটিই হুমায়রার বাবা আর তরুণ হলো জাভেদ–ইন্দ্রনাথ নামে সে পরিচিত।

বনহুর সব মনোযোগ সহকারে শুনলো এবং অনুধাবন করলো। সন্ন্যাসীকে ইন্দ্রনাথই হত্যা করে সেই সাত রাজার ধন মানিক উদ্ধার করে এনে রাণীকে দিয়েছে এবং সে ফিরে গেছে পুনরায় সন্ন্যাসীর আস্তানায়। বললো বনহুর–ইন্দ্রনাথ তাহলে তোমার সেই মূল্যবান সম্পদটা ফেরত দিয়ে গেছে।

হাঁ বনহুর। সত্যি তার ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করেছে। একটু থেমে পুনরায় বললো রাণী–আমি সেই তরুণকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, কারণ তার প্রতি আমার ভীষণ একটা আগ্রহ জন্মেছে। তাকে আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই…

তাকে পাবার পূর্বেই তোমরা ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়েছিলে?

হাঁ, তোমার অনুমান সত্য। বললো রাণী। বনহুর উঠে দাঁড়ালো, তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে একটা গভীর চিন্তার ছাপ। ওদিকে একপাশে গিয়ে নিজের মুখোভাবকে গোপন করার চেষ্টা করলো।

রাণীর দৃষ্টি এড়ালো না, সে বললো–বনহুর, জানি ঐ তরুণের সঙ্গে তোমার কোনো সম্বন্ধ আছে।

এবার বনহুর ফিরে দাঁড়ালো, সে বুঝতে পারলো রাণী তার মুখোভাব লক্ষ্য করেছে, তার মনের ব্যথা প্রকাশ পেয়েছে তার মুখে। হাসবার চেষ্টা করে বললো বনহুর–রাণী, তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। যে তরুণ তোমার মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে সে ইন্দ্রনাথ নয়, তার নাম জাভেদ।

জাভেদ! তোমার সন্তান জাভেদ? হ। সত্যি আমি ভুল করিনি তাহলে। বললো রাণী।

এমন সময় চন্দনা একটা রেকাবিতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য এবং ফলমূল নিয়ে হাজির হয়। বনহুরের সম্মুখস্থ টেবিলে রেখে বলেনিন, খান।

রাণী বললো–আমি জানি বনহুর ফল খেতে খুব ভালবাসে।

ও, তাই বুঝি রাণীর নির্জন আস্তানায় এত ফলের সমারোহ

চন্দনা হেসে বললো–বনহুর যেমন ফল খেতে ভালবাসে তেমনি রাণীজীও।

তবে এসো রাণী, একসঙ্গে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করি। কথাটা বলে একটা ফল তুলে নিলো বনহুর হাতে।

রাণীও ফল খেতে শুরু করলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা ছোরা এসে বিদ্ধ হলো বনহুরের বাম বাজুতে। একটা অস্ফুট শব্দ করে। উঠলো–সে–উঃ! সঙ্গে সঙ্গে ছোরাখানা টেনে তুলে ফেললো বনহুর নিজেই।

রাণীর মুখমন্ডল মুহূর্তে রক্তরাঙা হয়ে উঠলো, তার আস্তানায় কে এমন আছে যে বনহুরকে ছোরাবিদ্ধ করলো।

চন্দনার মুখখানাও ভয়বিহ্বল হয়ে উঠলো। সেও ভেবে পাচ্ছে না রাণীর গোপন আস্তানায় কে এমন আছে যে বনহুরকে লক্ষ্য করে ছোরা নিক্ষেপ করতে পারে?

রাণী তাড়াতাড়ি বনহুরের ক্ষতস্থানে হাতচাপা দিলো।

চন্দনা বললো–রাণী, কে এমন কাজ করলোর

শিগগীর ওষুধ নিয়ে আয়, তারপর দেখছি। রাণীর কণ্ঠস্বরে ভীষণ একটা উদ্বিগ্নতা শোনা গেলো।

ছুটে গেলো চন্দনা ওষুধ আনতে।

ওদিকে বিপদসংকেত ঘন্টা বাজতে শুরু করেছে।

মুহূর্তে একটা হুলস্থূল ভাব রাণীর আস্তানাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ওষুধ নিয়ে হাজির হলো চন্দনা।

অভিজ্ঞ অনুচর রহমত এলো, সে বনহুরের ক্ষত স্থানে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে লাগলো।

রাণী বললো–বনহুর, আমি বড় দুঃখিত তোমার এ অবস্থার জন্য। একটু থেমে বললো–আমি তাকে খুঁজে বের করবোই যে তোমাকে অস্ত্র নিক্ষেপ করে আহত করেছে। উঃ কি সাংঘাতিক সাহসী সে....

কথা শেষ হয় না রাণীর, দুজন অনুচর হাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় এক যুবককে পাকড়াও করে নিয়ে আসে।

চমকে উঠে রাণী, এ যে ইন্দ্রনাথ!

চন্দনার দুচোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে; তার মুখেও কোনো কথা নেই। ভাবছে চন্দনা, এই তরুণকে বহু খুঁজেও তারা পায়নি অথচ রাণীর আস্তানায় সেই তরুণ......।

রাণীর কথায় চন্দনার চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বলে উঠলো রাণী–ইন্দ্রনাথ তুমি! তুমি আমার অতিথিকে এভাবে আহত করেছে!

ইন্দ্রনাথ কোনো জবাব দিলো না, তার মুখমন্ডলে একটা কঠিন ভাব ফুলেট উঠেছে।

রাণী বললো–তুমি আমার মন জয় করেছিলে তোমার উদারতা দিয়ে কিন্তু এখন আমি তোমাকে এ কারণে উপযুক্ত শাস্তি দেবে এবং সে শাস্তি অতি ভয়ংকর।

বনহুর নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে ইন্দ্রনাথের দিকে। জাভেদ কত পরিবর্তন হয়ে গেছে, এত কাছে তবুও সে তাকে চিনতে পারছে না।

ততক্ষণে বনহুরের ক্ষত স্থানে ওষুধ এবং ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়ে গেছে। রাণী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো–ওকে নিয়ে যাও, বন্দীশালায় সতর্কভাবে আটক করে রাখো, বিচার হবে আমার দরবারকক্ষে।

বনহুরের মুখমন্ডলে একটা উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠলো, কারণ জাভেদের আচরণে রাণী ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বনহুর নিশ্চুপ থাকতে বাধ্য হলো।

অনুচরগণ জাভেদকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় নিয়ে গেলো।

রাণী বললো–বনহুর, তোমার সন্তান বলে সে আমার কাছে ক্ষমা পাবে না, কারণ যে অন্যায় সে করেছে তার ক্ষমা নেই। প্রথমতঃ সে আমার বিনা অনুমতিতে আমার আস্তানায় প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয়তঃ তুমি আমার অতিথি, বিনা কারণে সে তোমাকে ছোরাবিদ্ধ করেছে। তৃতীয়তঃ সে সন্তান হয়ে পিতাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো।

বনহুর একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো–রাণী, তোমার পূর্বের কথায় আমি যা জেনেছি তাতে তার কোনোটাই অপরাধ নয়।

বল কি বনহুর।

হাঁ।

সে এতগুলো অপরাধ একসঙ্গে করেছে অথচ তুমি বলছো সে যা করেছে তা অপরাধ নয়?

বনহুরের মুখ থেকে এখনও হাসির আভাস মুছে যায়নি। যদিও ক্ষতস্থানের যন্ত্রণায় তার মুখোভাবে কিছুটা যন্ত্রণার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিলো, তবু সে নিজেকে সংযত রেখে বললো–তোমার বিচারে যা ভাল মনে করো তাই হোক।

*

গভীর রাত।

বনহুর বড় অসুস্থ বোধ করছিলো, তাই সে দুচোখ বন্ধ করে বিছানায় পড়ে ছিলো। দস্যুরাণীর আস্তানায় তার কোনো অসুবিধা হয়নি। রাণী তার উপযুক্ত বিশ্রামের আয়োজন। করেছিলো। রাণী জানতো ফল বনহুরের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য, তাই রাণী প্রচুর ফলের আয়োজন করেছে।

সেবা-যত্নের ত্রুটি নেই।

মাঝে মাঝে রাণী নিজে এসে বনহুরকে দেখে যাচ্ছে।

কোমল বিছানায় দুচোখ বুজে পড়েছিলো বনহুর। হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেলো, একটা তীব্র। যন্ত্রণাকাতর শব্দ কানে ভেসে এলো তার।

বনহুর কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো। স্পষ্ট সেই কণ্ঠ, যে কণ্ঠস্বর তার মনকে বিচলিত করে। জাভেদের যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠ। শয্যা ত্যাগ করে বনহুর নেমে পড়লো। এগুলো সে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে।

দেয়ালের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগুচ্ছে বনহুর।

প্রহরীর ছায়া সরে যেতেই আবার সে এগুলো।

বুঝতে পারলো না প্রহরী কেউ তার ছায়ার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সরে গেলো।

পর্বতের তলদেশ।

বাইরের জগতের কোনো শব্দ এখানে প্রবেশ করতে পারে না। শুধু শোনা যাচ্ছে প্রহরীর ভারী বুটের আওয়াজ। আর শোনা যাচ্ছে একটা যন্ত্রণাকাতর ক্ষীণ আর্তনাদ।

শব্দটা বনহুরের কঠিন মনকে অস্থির করে তুলছে। দ্রুত এগুচ্ছে সে।

অনেকগুলো গুহা অতিক্রম করে এগিয়ে এলো বনহুর। পাশের গুহা থেকেই যন্ত্রণাকাতর শব্দটা ভেসে আসছিলো।

তাকালো বনহুর।

দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করলো।

গুহার মধ্যে নজর পড়তেই ভীষণ চমকে উঠলো। দেখতে পেলো একটা লোহার রডের সঙ্গে জাভেদকে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে। তার দুচোখ কালো কাপড়ে বাঁধা। দুপাশে শিকল দিয়ে তাকে দুজন অনুচর টেনে ধরে রেখেছে। হাত দুখানা আলাদা রডের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা।

সামনে রাণী জমকালো ড্রেসে সজ্জিত অবস্থায় দন্ডায়মান। তার হাতে একটা চাবুক। রাণী চাবুক দিয়ে জাভেদের দেহে আঘাত করে চলেছে।

মশালের আলোতে গুহার মধ্যে সবকিছু স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। বনহুর দেখলো জাভেদের দেহের স্থানে স্থানে কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

যন্ত্রণায় জাভেদের মুখ দিয়ে কষ্টদায়ক শব্দ বেরিয়ে আসছিলো।

ভীষণ আঘাতের পর আঘাত করে যাচ্ছে রাণী। দাঁতে দাঁত পিষে বলছে রাণী– তোমার কাজের উপযুক্ত পুরস্কার গ্রহণ করো। পুনরায় আঘাত করে রাণী।

বনহুর এবার ক্ষিপ্রগতিতে গুহায় প্রবেশ করে চাবুকসহ রাণীর হাতখানা ধরে ফেলে–রাণী, এ তুমি কি করছো?

রাণীর দুচোখে আগুন ঝরে পড়ছে।

ফিরে তাকালো সে বনহুরের দিকে।

কঠিন কণ্ঠে বললো রাণী–আমাকে ছেড়ে দাও। ওর উপযুক্ত শাস্তি আমি ওকে দেবো।

এবারের মত ক্ষমা করে দাও রাণী!

তুমি যা ভেবেছো তা কোনোদিন সম্ভব নয়। হতে পারে সে তোমার........

রাণীর মুখে হাতচাপা দেয় বনহুর, এর বেশি আর আমি শুনতে চাই না রাণী। তুমি যা খুশি তাই করো। আমি চলে যাচ্ছি।

হাঁ, তুমি চলে যাও। আমি তোমাকে ওর জন্য ভাবতে দেবো না।

রাণী, তুমি তো সব শুনেছে।

বললাম তোমাকে আমি কোনো কথা শুনাতে চাই না। যে সন্তান পিতাকে হত্যার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তাকে তুমি ক্ষমা করতে পারে কিন্তু আমি পারি না। আমি……

রাণী, ও তোমাকে তোমার মূল্যবান সম্পদ ফিরিয়ে এনে দিয়েছে……

তার জন্য তাকে আমি পুরস্কৃত করতে চেয়েছি।

ক্ষমা করাটাই হবে তার সেই পুরস্কার।

বনহুর, তুমি চাও আমি ওকে মুক্ত করে দেই।

হাঁ চাই।

বেশ, তাই হোক।

বনহুর বেরিয়ে গেলো।

রাণী অনুচরদের ইংগিত করলো ইন্দ্রনাথকে মুক্ত করে দিতে।

ইন্দ্রনাথ মুক্ত হলো।

রাণীর আদেশমত তাকে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় আস্তানার বাইরে নিয়ে গেলো তারপর তাকে সমুদ্রতীরে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এলো।

অনুচরগণ ফিরে না আসা পর্যন্ত রাণী পায়চারী করছিলো। পাশের হার মধ্য হতে শুনতে পাচ্ছিলো বনহুর রাণীর বুটের শব্দ। ইন্দ্রনাথকে শাস্তি দিয়ে রাণীও খুশি নয়। নিশ্চয়ই সে মনে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করছে। বনহুর নিজেও অনুভব করছে রাণীর অবস্থাটা, কারণ সে জানে রাণী সম্পূর্ণ হৃদয়হীন নয়। তার মনেও আছে দয়ামায়া স্নেহ মমতা…….

হঠাৎ চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বনহুরের, পাশের গুহা থেকে ভেসে আসে পুরুষ কণ্ঠস্বর–রাণীজী, আপনার নির্দেশমত আমরা কাজ করেছি।

রাণীর ভারী বুটের শব্দ থেমে গেলো।

কোথায় রেখে এলে তাকে?

সমুদ্রের তীরে।

অনুচরটা হয়তো চলে যাবার জন্য পা বাড়াচ্ছিলো তাই পুনরায় শোনা গেলো রাণীর গলা–শোন।

অনুচরটা বোধ হয় থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো।

রাণীর গলা শোনা গেলো, বললো রাণী–ওর জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে, কারণ–সে এখন স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন নয়......একটু থেমে বললো রাণী–যাক তার উপযুক্ত শাস্তিই সে পেয়েছে। গলার স্বর আরও কিছুটা নিচু করে বললো রাণী–পাশের গুহায় ওর পিতা ঘুমিয়ে আছে, তাকে কোনো কথা জানাবে না, বুঝলে?

আচ্ছা রাণীজী! অনুচরটা বেরিয়ে গেলো বলে মনে হলো বনহুরের।

বনহুর নিশ্চুপ দুচোখ মুদে পড়ে রইলো। ভাবছে বনহুর জাভেদের কথা, কারণ নূরীর করুণ মুখখানা তাকে সর্বক্ষণ অস্থির করে তোলে। তার ওপর সব সময় ফুল্লরার প্রশ্ন কেন জাভেদ ফিরে আসছে না। শুধু নূরী আর ফুল্লরাই নয়, কান্দাই আস্তানার প্রতিটা ব্যক্তি আজ জাভেদের অন্তর্ধানে মর্মাহত, সব সময় একটা দারুণ অশান্তি বিরাজ করছে আস্তানায়।

মাঝে মাঝে বনহুর হাঁপিয়ে উঠেছে। নূরীর বিষণ্ন মুখোভাব বনহুরকে বিচলিত করে তোলে, সত্যি কি বনহুর নিজে হৃদয়হীন। দয়ামায়া মমতা কিছু কি নেই তার। সত্যি কি জাভেদের জন্য তার দরদ নেই। জাভেদ তার সন্তান, সবাই মনে করে বনহুরের মন জাভেদের জন্য ব্যথিত নয় কিন্তু তারা জানে না সন্তানের প্রতি কতখানি স্নেহ রয়েছে তার।

দুচোখ মুদে ভাবছিলো বনহুর, ঠিক সেই মুহূর্তে গুহার মধ্যে কেউ প্রবেশ করলো বলে মনে হলো তার। যদিও বনহুর বুঝতে পারলো রাণী ছাড়া কেউ নয়

তবু সে কোনো কথা বললো না, যেমনটা শুয়ে ছিলো তেমনি রইলো।

পদশব্দ শয্যার পাশে এসে থেমে গেলো।

বনহুর বুঝতে পারলো রাণী তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো।

অপেক্ষা করতে লাগলো বনহুর এরপর কি ঘটে তার জন্য।

কয়েক মিনিট কোনো কথা বা কোনো শব্দ শোনা গেলো না। রাণী তাকে লক্ষ্য করছে হয়তো। বনহুর নিশ্চুপ রইলো।

এমন সময় দ্বিতীয় পদশব্দ কক্ষে প্রবেশ করলো। বনহুর আহত হওয়ায় বেশ ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে, তাই শান্ত মানুষটি হয়ে শুয়ে আছে সে।

রাণীর প্রবেশ বনহুর অনুধাবন করলেও পরে কে প্রবেশ করলে তা সে বুঝতে পারলো না। তবে একটু পরেই বেশ বুঝলো কে সে।

বললো রাণী–ওর অনেক রক্তপাত হয়েছে, কাজেই আমি চিন্তিত আছি চন্দনা এবং সে কারণেই আমি ওকে ধরে রেখেছি আমার আস্তানায়। যতক্ষণ না বনহুর সুস্থ হয়ে উঠবে ততক্ষণ ওকে ছাড়বো না। জেগে উঠলে ওষুধ খাইয়ে দিস।

চন্দনার কণ্ঠস্বর শুনলে বনহুর–বেশ, তোমার কথামতই কাজ করবো। আচ্ছা রাণী, একটা কথার জবাব দেবে?

দেবো। রাণীর গলার স্বর।

চন্দনা বললো–যখন জানতে পারলে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে বনহুরের সম্পর্ক আছে, তখন তুমি তাকে কেন ক্ষমা করলে না রাণী?

নিজ সন্তান হলেও আমি ক্ষমা করতাম না।

সে তোমাকে তোমার অমূল্য সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছে, এ কথাও কি তুমি ভুলে গিয়েছিলে?

মোটেই না।

এ সব ছাড়াও তার বয়স নিতান্ত কম। ভুল করে সে নিজের পিতাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। এ ছাড়াও সে এখন স্বাভাবিক সম্বিৎহারা।

জানি তবু আমার কাছে ক্ষমা নেই, কারণ যে অন্যায় সে করেছে তা ক্ষমাহীন। যেভাবে সে ছোরা নিক্ষেপ করেছিলো তাতে বনহুরের মৃত্যু ঘটতে পারতো। যাক সে সব কথা আমি যা বললাম সেইভাবে কাজ কর।

আর তুমি?

আমি যাচ্ছি ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে।

রাণী!

হাঁ

এক্ষুণি যাচ্ছো তুমি।

হাঁ, এক্ষুণি যাচ্ছি।

কিন্তু......

তোর কিছু ভাবতে হবে না। বনহুরের দিকে ভালভাবে খেয়াল রাখবি।

রাণী, একদিন যাকে তুমি শত্রু মনে করতে আজ সে তোমার বন্ধু।

মিথ্যা নয় চন্দনা, সত্যি বনহুর মহৎ... আচ্ছা চলি, কেমন? রাণীর ভারী বুটের শব্দ গুহার বাইরে বেরিয়ে গেলো।

চন্দনা একটা আসন টেনে নিয়ে বসলো বনহুরের শিয়রে।

বনহুর কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকলেও সে এবার আর চুপ রইলো না। পাশ ফিরে বললো–সবই শুনলাম।

এ্যা, আপনি জেগে ছিলেন।

এত সামান্যে আমার কিছু হয় না চন্দনা।

উঃ কি সাংঘাতিক লোক আপনারা। রাণীও ঠিক আপনারই মত।

মানে?

বহুদিন দেখেছি ভীষণ আহত হয়েও সে ঘাবড়ে যায়নি কিংবা ভেঙে পড়েনি অথবা অসুস্থ হয়নি...

সত্যি যদি তেমন কিছু না হয় তবে কেন ঘাবড়ে থাকবে বলো? যাক এবার আমাকেও যেতে হবে....

চমকে উঠে বললো চন্দনা–বলছেন কি চলে যাবেন? দাঁড়ান তাহলে রাণীকে...

না, কাউকে বলতে হবে না।

রাণীর বারণ আপনাকে যেন ছেড়ে না দেই। তা ছাড়া আপনার শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। রীতিমত ওষুধ খেতে হবে আপনাকে।

একটু হেসে বললো বনহুর–ওষুধ! বনহুর কোনো সময় ওষুধ খায় না চন্দনা।

কিন্তু রাণীর নির্দেশ...

ওষুধ আমাকে খেতেই হবে।

হাঁ

তাহলে দাও সবগুলো একসঙ্গে খেয়ে এই মুহূর্তে সেরে উঠি।

এবার খিল খিল করে হেসে উঠলো চন্দনা, হাসি থামিয়ে বললো–আপনার কথা শুনে বড় হাসি পাচ্ছে আমার!

তা তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু কেন হাসছে তার কারণ বুঝতে পারছি না।

আমার হাসির কারণ বুঝতে পারছেন না?

না।

কেউ কোনোদিন সব ওষুধ একসঙ্গে খায়?

কেন খাবে না, ধরো ক্ষুধা পেলে একসঙ্গে খাবার খেয়ে যেমন উদর পূর্ণ করি তেমনি…

চুপ, এ কথা শুনলে লোকে হাসবে।

ভয় নেই, একমাত্র হাসবার জন্য তুমি ছাড়া আশেপাশে কেউ নেই।

সত্যি আপনি অদ্ভুত মানুষ।

এ কথা সবাই বলে।

কেন বলে?

তা তো জানি না।

চন্দনা এবার স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। ভাবছে চন্দনা, এই লোকটিকে বন্দী করার জন্য একদিন রাণী ও তার অনুচরবর্গ হন্যে হয়ে উঠেছিলো, কৌশলে বন্দীও করা হয়েছিলো কিন্তু বনহুর লৌহকপাট ভেঙে পালাতে সক্ষম হয়েছিলো। শুধু তাই নয়, গোটা পৃথিবী যার নামে কম্পিত হয় সেই দস্যু বনহুর তার সামনে……

কি ভাবছো চন্দনা?

ভাবছি আপনাকে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ধরে রাখতে পারবো কিনা কে জানে।

ভাবছো রাণীর কাছে কি কৈফিয়ত দেবে!

তা তো দিতেই হবে যদি আপনি আমার……

মানে কথা না শুনি? চন্দনার কথার মাঝখানে কথাটা বলে ওঠে বনহুর।

চন্দনা ওষুধ ঢেলে বনহুরকে বললো–ওষুধ খেয়ে নিন। আমি আপনার কোনো কথা শুনবো না।

বেশ খাচ্ছি তবু যদি খুশি হও।

হাসলো চন্দনা।

বনহুর ওষুধ খেয়ে ছোট গেলাসটি চন্দনার দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

চন্দনা বললো–এবার ঘুম, আমি চলি।

বসো চন্দনা। তোমার কথাগুলো আমাকে বড় আনন্দ দিচ্ছে।

চন্দনা বনহুরের কথা ফেলতে পারলো না। সে বনহুরের শিয়রে বসলো, তারপর বললো–সত্যি আপনার জন্য রাণী খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে.....

অহেতুক চিন্তিত হয়েছে সে। এমন কতবার আহত হয়েছি কত রক্তপাত হয়েছে......তবুও বেঁচে আছি আজও। যাক সে সব কথা, একটা ব্যাপার আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে।

বলুন কি ব্যাপার? যদি সাহায্য করতে পারি কিছু। কথাগুলো বলে বনহুরের চোখে চোখ রাখলো চন্দনা।

বললো বনহুর–রাণী আমার সঙ্গে যতই বন্ধুত্ব স্থাপন করুক না কেন, রক্তে আঁকা ম্যাপ আমার চাই এবং আমি তা নিয়ে রক্তে আঁকা ম্যাপের রত্নের সন্ধানে রওয়ানা দেবো বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে।

চন্দনা বললো–আমি জানতাম রক্তে আঁকা ম্যাপ রাণী তোমার হাতে তুলে দিয়েছে।

হাঁ, এমন একটা ঘটনা ঘটেছিলো কিন্তু......যাক, সব শুনে লাভ নেই। একথা হবে রাণীর সঙ্গে। নতুন কোনো কথা শোনাও চন্দনা।

আপনি অসুস্থ, কথা বলা এবং শোনা নিষিদ্ধ। বরং আপনি ঘুমান, আমি চলে যাই।

তুমি চলে গেলেও আমার ঘুম আসবে না চন্দনা। একটু থেমে বললো–সত্যি আমি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছি এবং সে কারণেই এখনও শয্যায় শয়ন করে আছি। নইলে আমাকে তোমরা কেউ ধরে রাখতে পারতে না।

চন্দনা বললো–তখন আমরা আপনাকে নিয়ে এত ভাবতাম না।

চন্দনা!

বলুন?

রাণী কি একাই ইংরেজ শিকারীদের সন্ধানে গেলো?

না, তার সঙ্গে রয়েছে প্রধান অনুচর রহমত আলী।

তোমার ছুটি, তাই না?

হাঁ, তবে আপনি আহত না হলে আমাকেও তার সঙ্গে যেতে হতো। এটা সুনিশ্চয়। রাণীর খেয়ালের সীমা নেই। জানেন তো ইন্দ্রনাথকে খুঁজতে গিয়ে আমরা ইংরেজ শিকারীদের কবলে পড়ে গিয়েছিলাম। যদি আপনি ঐ মুহূর্তে না পৌঁছতেন তাহলে এতক্ষণ আমাদেরকে ইংরেজদের জাহাজের খুপড়ীর তলদেশে বন্দী থাকতে হতো। সত্যি আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বনহুর একটু হেসে বললো–আমাকে যেভাবে তোমরা আদর যত্ন দেখাচ্ছ তাতে আমি নিজকে ঋণী মনে করছি। ধন্যবাদ গ্রহণের প্রয়োজন হবে না।

এবার চন্দনা বললো–আপনার ঘুমানো দরকার। আমি আবার আসবো......

আমি ঘুমালে এখানে কারও প্রয়োজন হবে না। তুমি চিশ্চিন্তভাবে বিশ্রাম করতে পারো। কথাগুলো বলে পাশ ফিরে শুলো বনহুর, এমনভাবে যেন তার ক্ষতস্থানে চাপ না লাগে।

চন্দনা বেরিয়ে গেলো।

বনহুর চোখ মুদে ভাবতে শুরু করলো, না জানি জাভেদকে রাণীর অনুচরগণ সমুদ্র তীরে কোথায় রেখে এলো। তার কাছে কোনো অস্ত্র নেই, তাছাড়া স্বাভাবিক সংজ্ঞাহীন এখন সে......ভুলে গেলো বনহুর তার ক্ষত আর ব্যথার কথা। শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো সে। যদিও তার ক্ষতস্থানে বেশ যন্ত্রণা হচ্ছিলো।

*

কিছুক্ষণ পর চন্দনা বনহুরের গুহায় প্রবেশ করে বিস্ময়ে থহয়ে গেলো। বনহুর নেই–শয্যা শূন্য।

তাকালো চন্দনা চারদিকে।

গুহার দেয়ালে বনহুরের মাথার জমকালো পাগড়িটা লটকানো ছিলো, সেটা নেই।

মশালের আলোতে চন্দনা তাকালো পাশের হার দিকে। জমাট অন্ধকার ছাড়া কিছুই নজরে পড়ছে না, তাই চন্দনা মশালটা দেয়াল থেকে তুলে নিলো, তারপর অন্ধকার গুহার মধ্যে সতর্কভাবে দৃষ্টি ফেললো। আরো বিস্মিত হলো সে, কারণ অন্ধকারে গুহার সুড়ঙ্গপথে বনহুর বেরিয়ে গেছে। বনহুর এ পথের সন্ধান কেমন করে পেলো বুঝতে পারলো না চন্দনা।

এখানে যখন চন্দনা বনহুরকে নিয়ে ভাবছে তখন বনহুর রাণীর জাম্বুর পর্বতের গোপন সুড়ঙ্গপথে নেমে চলেছে নিচের দিকে।

অবশ্য চন্দনা ইচ্ছা করলে অনুচরদের জানাতে পারতো এবং সুইচ টিপে সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করতে পারতো কিন্তু সে তা করলো না, কারণ বনহুরকে তারা বন্দী হিসেবে এখানে আনেনি। সে তাদের হিতাকাক্ষী হিসেবে এসেছিলো।

তবু চন্দনা হাতে তালি দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে দুজন অনুচর এসে হাজির হলো। তারা চন্দনাকে কুর্ণিশ জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। আস্তানার সবাই চন্দনাকে সম্মান জানাতে এবং ভয়ও করতে, কারণ চন্দনা রাণীর সহচরী।

রাণীর আস্তানায় চন্দনার বিচরণ সর্বত্র এবং সবকিছু নির্দেশ দেবার ক্ষমতাও ছিলো তার।

বললো চন্দনা–বনহুর উধাও হয়েছে।

একজন বলে উঠলো–কোন্ পথে বনহুর আস্তানা থেকে বেরিয়ে গেলো আমরা বুঝতে পারছি না।

অপর জন বললো–এমন সজাগ পাহারার মধ্য দিয়ে সে পালালো কি করে?

যদি জানতাম তাহলে কি আর পালাতে পারে।

যাই আমরা দেখি কোথায় গেলো সে।

না, তোমাদের যেতে হবে না। আমি নিজে দেখছি। তারপর আপন মনে বললো–অসুস্থ অবস্থায় যাওয়া তার ঠিক হলো না...... রাণী এসে আমাকেই দোষারোপ করবে। যাও, তোমরা নিজ নিজ কাজে যাও।

অনুচরদ্বয় কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেলো।

চন্দনা সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হলো। এ পথ অনুচরদের অজানা। চন্দনা আর রহমত ছাড়া আর কাউকে এ সুড়পথের সন্ধান রাণী দেয়নি। কাজেই এ পথ সবার অজানা।

বনহুর কি করে এ সুড়ঙ্গপথের সন্ধান পেলো চন্দনা বিস্মিত হয়েছিলো। তার স্মরণ হলো বনহুরের অজানা কিছু নেই। তাকে যেমন বুঝা মস্কিল তেমনি তার সম্বন্ধে জানাও যায় না কিছু। কেমন করে বনহুর এই সুড়ঙ্গপথের সন্ধান পেলো সেই জানে...চন্দনা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চলার পর পর্বতের পাদমূলে এসে পৌঁছে গেলো চন্দনা। আলোর ঝলক তার চোখ দুটোকে দীপ্ত করে তুললো, কারণ এতক্ষণ সে একটানা অন্ধকারে এগিয়ে এসেছে। সুড়ঙ্গমুখের পাথর সরে যাওয়ায় সূর্যের আলোর কিছুটা রশি প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে সুড়ঙ্গমধ্যে।

চন্দনা বুঝতে পারলো যাকে ধরে রাখার নয় তাকে কোনো রকমে ধরে রাখা যাবে না। বনহুর সত্যি এক বিস্ময়....।

সুড়ঙ্গমুখ থেকে বেরিয়ে এলো চন্দনা।

নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো, সীমাহীন শূন্যতা চারদিকে বিরাজ করছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো চন্দনার বুক চিরে।

*

অনেক খুঁজেও বনহুর আর পেলো না জাভেদকে। সমুদ্রতীর ধরে তাজকে নিয়ে সন্ধান করে চললো। বালুকাভূমির ওপর কোনো মানুষের পদচিহ্ন দেখা যায় কিনা, কিন্তু কোনো রকম পদচিহ্ন তার নজরে পড়লো না।

ক্রমে বনহুরের দেহ ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে এলো। তার ক্ষতস্থান ব্যথায় জর্জরিত হলো। ক্ষুধা পিপাসায় নিতান্ত কাতর হয়ে পড়লো বনহুর।

এক সময় বনহুর ফিরে এলো হুমায়রার কুটিরে।

হুমায়রা বনহুরকে নিজের কুটিরে আশ্রয় দিলো এবং তার ক্ষতস্থানে ওষুধের প্রলেপ লাগিয়ে দিয়ে বললো–এ ওষুধ আমার জ্যোতিষী বাবার কাছে শেখা। দেখো তুমি দুদিনেই সেরে উঠবে।

বনহুরকে তার কুটিরে বিছানা পেতে শুইয়ে দিলো। সেবাযত্ন করতে লাগলো সে মনপ্রাণ দিয়ে। একসময় বললো হুমায়রা–ইন্দ্রনাথকে তুমি দেখেছো?

ইন্দ্রনাথ যে তাকে হত্যার চেষ্টা করেছিলো এবং তার দেহের ক্ষত যে তারই সৃষ্টি এ কথা বনহুর বললো না হুমায়রার নিকটে। সব গোপন রেখে প্রতীক্ষা করতে লাগলো জাভেদ এখানে আসে কিনা।

জ্যোতিষীর তৈরি মহৌষধ এত ফলদায়ক ছিলো যে বনহুরের ক্ষত দুচার দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো। কিন্তু জাভেদ ফিরে এলো না।

বনহুরের মনে ভীষণ একটা দুশ্চিন্তা তাকে বিভ্রান্ত করে তুললো।

হুমায়রা বলে–সত্যি তুমি কত ভাল আর ইন্দ্রনাথ বড়ড় খেয়ালী, কিছু বুঝতে চায় না। দেখছোনা কতদিন হলো গেছে, তার ফিরবার কথাটি নেই।

বনহুর বললো–হু। ছোট্ট একটা জবাব তার।

খুশি হলো না হুমায়রা।

বললো সে—বলো তো তুমি সব সময় কি ভাবো?

তোমার ভাবনা আর আমার ভাবনা এক। কারণ তুমি যার জন্য ভাবছো আমিও তার জন্য ভাবছি।

তুমিও ইন্দ্রনাথের জন্য ভাবছো?

হাঁ হুমায়রা।

কিন্তু সে তোমার প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলো তবুও ভাবছো তার কথা? তাহলে তুমিও কি তাকে ভালবেসেছো?

যদি বলি হাঁ তুমি বিশ্বাস করবে?

জানি ওকে কেউ ভাল না বেসে পারবে না। তাই তুমিও বেসেছে, কিন্তু...

বলো থামলে কেন, কিন্তু কি?

ও তোমাকে হত্যা করতে চায় অথচ তুমি তাকে ভালবাসো, আশ্চর্য...

বনহুর কি বলতে গিয়ে থেমে গেলো, চোখ দুটো তার ছল ছল করে উঠলো! যতই নির্দয় হোক না কেন, তবু তো সে পিতা।

হুমায়রা বললো–নিশ্চুপ কি ভাবছো?

না কিছু না। সত্যি হুমায়রা, তুমি বড় লক্ষী মেয়ে। তোমার সেবা–যত্নে আজ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছি। একটু থেমে বললো বনহুর–হুমায়রা, ইন্দ্রনাথের জন্য তুমি কি এখানে অপেক্ষা করতে চাও?

অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো হুমায়রা।

বনহুর বললো–এই গভীর বনে তুমি একা থাকতে পারবে?

এবার চোখ ফেরালো বনহুরের দিকে। সে চোখে বনহুর দেখতে পেলো একটা অসহায় করুণ ব্যথা জর্জরিত ভাবের প্রতিচ্ছবি। হুমায়রার মুখের পাশে ভেসে উঠলো আর একটা মুখ, সে মুখ ফুল্লরার। নূরীর মুখে শুনেছে ফুল্লরা ভালবাসে জাভেদকে, অন্তর দিয়ে ভালবাসে সে তাকে কিন্তু জাভেদ ওকে মোটেই তোয়াক্কা করে না...একটু হাসি পেলো বনহুরের, কারণ তার জীবনেও এমন ঘটনার অবশেষ নেই।

হুমায়রা মাথা নত করে নিলো, কারণ সে একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় এখানে থাকবে কি করে!

তার মনোভাব বুঝতে পারলো বনহুর, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে নীরবে স্নেহ জানালো।

হুমায়রা বললো–ও আর কোনোদিন ফিরে আসবে না?

বললো বনহুর–জানি না। জানি না হুমায়রা সে আর ফিরে আসবে কি না। একটু থেমে বললো সে–আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।

কোথায়?

যেখানে আমি থাকি।

তুমি কোথায় থাকো?

সে অনেক দূর, কান্দাই....

তুমি কান্দাই থেকে জম্বু এসেছো?

হাঁ

তুমি দেখছি আশ্চর্য মানুষ।

তার চেয়েও বেশি আশ্চর্যজনক আমি। হুমায়রা, তুমি যদি আমার আসল পরিচয় জানতে তাহলে কিছুতেই তুমি এমনটি করে আমাকে আদর যত্ন করতে পারতে না।

মিথ্যা কথা, তুমি অপূর্ব, তুমি পৌরুষদীপ্ত পুরুষ। তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি......

হুমায়রা, তুমি বড় সুন্দর কথা বলতে পারো।

লজ্জায় মাথাটা নত করে নিলো হুমায়রা, নিজকে সহজ করে নেবার জন্য বললো–চলো তোমাকে খেতে দিই।

ক্ষুধা পায়নি।

বলল কি, ক্ষুধা পায়নি?

আর ক্ষুধা পেলেই বা আমাকে খাওয়াবে কি বলো!

কেন, বনে অনেক মিষ্টি ফল আছে। আমি ফল পেড়ে এনেছি তোমার জন্য।

আমার জন্য?

হাঁ

কখন গেলে হুমায়রা?

যখন তুমি ঘুমাচ্ছিলে।

ও।

আমি যাই......হুমায়রা চলে গেলো।

ভাবছে বনহুর ক্ষত তার সম্পূর্ণ সেরে গেছে। এখন সে শুধু অপেক্ষা করছে জাভেদের জন্য। নূরীর অবস্থা বড় শোচনীয়, জাভেদের চিন্তায় সে পাগলপ্রায়। তাছাড়া কচি ফুলের মত মেয়ে ফুল্লরা। জাভেদকে সে ভালবাসে অন্তর দিয়ে। বেচারী কেঁদে কেঁদে তার চোখের নিচে কালিমা পড়ে গেছে। একদিন যেমন নূরীর অবস্থা হয়েছিলো। আজও বনহুরের সেদিনের কথা মনে পড়লে আনমনা হয়ে যায়। নূরীর প্রতি বনহুর নিজেও বড় উদাসীন ছিলো। রহমান যদি তাদের মধ্যে একটা গভীর সম্বন্ধ গড়ে না তুলতে তাহলে হয়তো আজও নূরীর সঙ্গে তার কোনো......।

বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। হুমায়রা একটা রেকাবি ভর্তি করে নিয়ে এলো সুমিষ্ট ফল।

বনহুরের সম্মুখে রেখে বললো হুমায়রা–নাও, খেয়ে নাও।

এত সুন্দর পাকা ফল তুমি কোথায় পেলে? একটা ফল হাতে তুলে নিয়ে বললো বনহুর।

হুমায়রা বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললো–এ বনে ফলের অভাব নেই। তা ছাড়া আমি নিজে শহর থেকে কিছু ফলের গাছ এনে লাগিয়েছিলাম। এখন সেই গাছে অনেক ফল ধরে। তুমি দেখবে আমার লাগানো গাছগুলো কত সুন্দর……

বনহুর একটা ফল খেতে খেতে বললো–তুমি নিজ হাতে ফল গাছ লাগিয়েছো, সত্যি শুনেই আমি আনন্দ পাচ্ছি। ভারী ভাল লাগছে কিন্তু……

সত্যি?

হাঁ। হুমায়রা, আমি যদি তোমাকে নিয়ে যাই তাহলে তোমার এত সাধের ফল গাছগুলো এই গহন বনে ফেলে যেতে পারবে?

গভীরভাবে কিছু ভাবলো হুমায়রা, তারপর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো–জানি না কে আমার বাবা মা। জানি না কোথায় আমি জন্মেছিলাম। সব আজ আমার হারিয়ে গেছে–আমি হারিয়েছি আমার জ্যোতিষী বাবাকে……হারালাম ইন্দ্রনাথকে, আর আমি কার জন্য এ বনে পড়ে রইবো। শুধু ফলের গাছগুলো আমাকে ধরে রাখতে পারবে না। আমি যাবো তোমার সঙ্গে……

সত্যি বলছো হুমায়রা?

হাঁ, সত্যি বলছি আমি যাবো, নইলে মরে যাবো……

বনহুর হুমায়রার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে বললো–যা ধরে রাখবার নয় তা কোনোদিন ধরে রাখা যায় না। তুমি ভুলে যাও সবকিছু।

আমি যে ভুলতে পারছি না। সব ভুলতে পারি কিন্তু ওকে ভুলতে পারবো না। আমার ইন্দ্রনাথ কোনোদিন হারিয়ে যাবে না আমার জীবন থেকে।

হুমায়রা!

বলো?

তুমি মিছেমিছি এত বেশি ভাবছো। জীবন একটা নাটক, পৃথিবী একটা মঞ্চ। অনেক অনেক কিছুই জীবনে ঘটবে, তাই বলে সব মনে রাখতে হবে এমন কোনো

কথা নেই। জানো হুমায়রা, আমার জীবন নাটকে এমন বিস্ময়কর কত চরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে যা আমাকে শুধু বিভ্রান্তই করেনি, করেছে বিচলিত তবু আমি নিজকে হারিয়ে ফেলিনি। আমার চলার পথ রোধ করতে পারেনি কেউ।

তাহলে তুমিও কি কাউকে ভালবেসেছিলে কোনোদিন?

হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বনহুর।

বিস্ময়ে থ হয়ে তাকিয়ে রইলো হুমায়রা। এমন করে একজনকে সে হাসতে দেখেছে.....সে হলো ইন্দ্রনাথ। আশ্চর্য, এর সঙ্গে ইন্দ্রনাথের এত মিল!

কি ভাবছো হুমায়রা? বললো বনহুর।

হুমায়রা বললো–তুমি যেমন করে হাসো ঠিক তেমনি করে হাসে ইন্দ্রনাথ। সত্যি বড় ভাল লাগে আমার।

বনহুর ভাবলো, যাক আগের কথা হয় তো ভুলেই গেছে হুমায়রা, তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে।

কিন্তু হুমায়রা ভুলবার পাত্রী নয়, সে ঠিকই মনে রেখেছে কোন্ কথায় হেসেছিলো বনহুর। এবার হুমায়রা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো বনহুরের পাশে–বললে না তো তুমি কাউকে কোনোদিন ভালবেসে ছিলে কি না?

পূর্বের হাসির ক্ষীণ আভাস তখনও বনহুরের মুখে লেগে ছিলো, চোখ দুটো দীপ্ত উজ্জ্বল। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে কপালের চারপাশে।

হাতের ওপর মাথা রেখে চীৎ হয়ে শুয়ে ছিলো বনহুর।

হুমায়রা বনহুরের ললাটের চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বললো—-সত্যি করে বলো তুমি কাউকে ভালবেসেছিলে কোনোদিন?

হুমায়রা, তোমার প্রশ্ন অত্যন্ত কঠিন।

এই সামান্য প্রশ্নকে তুমি কঠিন বলছো? তুমি জীবনে কাউকে অন্তর দিয়ে ভালবেসেছো কিনা তাই জানতে চাই।

হাঁ, একজনকে আমি অন্তর দিয়ে ভালবাসি।

সত্যি সে ভাগ্যবতী। আচ্ছা সে তোমাকে ভালবাসে? মানে অন্তর দিয়ে ভালবাসে যেমনটি তুমি তাকে বাসো!

হাঁ, বাসে।

সত্যি?

হাঁ সত্যি।

কে সে?

আমার অশ্ব তাজ।

তোমার অশ্ব....কথাটা বলে খিল খিল করে হেসে ওঠে হুমায়রা, তারপর হাসি থামিয়ে বলে সে–আমি তোমার অশ্বের সম্বন্ধে বলিনি। আমি বলেছিলাম কোনো মেয়ে তোমাকে ভালবাসে কি না এবং তুমি তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসো কি না?

হুমায়রা, আমার জীবন বৈচিত্রময়। বড় কঠিন এ হৃদয়, যেখানে কোনো রেখাই দাগ কাটতে পারেনি।

সত্যি বড় অদ্ভুত মানুষ তুমি।

তা অবশ্য সত্যি, অদ্ভুতই বটে।

আমি যে প্রশ্ন করলাম তার জবাব তুমি কিন্তু দাওনি?

হুমায়রা, তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি সাধারণ মেয়ে নও। তুমি সত্যি বুদ্ধিমতী...প্রেম ভালবাসা সবার মনে বা হৃদয়ে আছে কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন ধরনের।

এ কথা বলছো কেন?

তোমার প্রেম অতি পবিত্র নির্মল। জানি তুমি ইন্দ্রকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো কিন্তু...

বলো থামলে কেন, বলো?

জানি না ইন্দ্র তোমার প্রেমের মর্যাদা দেবে কিনা। যাক ওসব কথা, তুমি যাবে আমার সঙ্গে। তোমাকে এখানে একা রেখে আমি যেতে পারি না। ইন্দ্রনাথ এখন স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন নয়। সে আর ফিরে আসবে কিনা সন্দেহ আছে।

না না, ও কথা বলো না। ও কথা বলো না তুমি। আমার ইন্দ্র আবার ফিরে আসবে। আমি তাকে ওষুধ খাইয়ে আবার আরোগ্য করে তুলবো। ওকে ছাড়া আমি বাচবো না!

যদি ফিরে আসে তাহলে মঙ্গল আর যদি ফিরে না আসে তাহলে একা এই গহন বনে তুমি নিঃসহায়, কাজেই মনস্থির করে ফেলল। চলল আমার সঙ্গে আমার আবাসস্থল কান্দাই জঙ্গলে।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো ময়রা বনহুরের মুখের দিকে।

একটু হেসে বললো বনহুর–জঙ্গলে শুনে অবাক হচ্ছে হুমায়রা, তোমার মত আমিও জঙ্গলের বাসিন্দা..

তুমি জঙ্গলে বাস করো?

হাঁ

আচ্ছা, তোমার পোশাক এমন জমকালো কেন?

যার যেমন ইচ্ছা তেমনি পোশাক সে পরতে পারে। আমার জমকালো পোশাকের প্রতি একটা মোহ আছে তাই আমি পরি, বুঝলে হুমায়রা? যাক ওসব কথা, কালকেই আমি রওয়ানা দেবো ভাবছি।

ও কথা বলো না। যতদিন আমার ই না ফিরে আসে ততদিন আমি কোথাও যাবে না।

তোমাকে যেতেই হবে হুমায়রা, কারণ তুমি এখানে সম্পূর্ণ একা। এ অবস্থায় তোমাকে রেখে যাওয়া আমার সমীচীন হবে না।

কিন্তু……।

কিছু ভেবো না, তোমার এ পর্ণকুটির যেমনটি আছে তেমনটিই থাকবে।

আমি কান্দাই যাবে না।

কেন?

সেখানে তোমার সবাই আছে, আমি তাদের মধ্যে নিজকে সামলে নিতে পারবো না।

বেশ, তুমি যাতে কোনো অসুবিধায় না পড়ো আমি ঠিক তেমনি জায়গায় তোমাকে রাখবো।

ইন্দ্র যদি এসে ফিরে যায়?

ওর প্রতীক্ষায় তুমি প্রহর গুণবে? আর যদি সে না আসে?

হুমায়রা কোনো জবাব দেয় না, তার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দুফোঁটা উষ্ণ পানি।

বনহুর সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে–জানি তোমার বড় দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু সব দুঃখের অবসান হবে যেদিন তুমি জানতে পারবে ইন্দ্রনাথের আসল পরিচয়। যাক ওসব কথা, তুমি তৈরি হয়ে নাও, আজই আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। আমার তাজ প্রস্তুত আছে……

হুমায়রা বললো– জ্যোতিষী বাবার আত্মা আমাকে অভিশাপ দেবে। এ কুটির ছেড়ে আমি যাবো না।

বনহুর হেসে উঠলো—-জ্যোতিষী বাবার আত্মা তোমাকে অভিশাপ দেবে না বরং আশীর্বাদ করবে তুমি তার আগেই অভিশপ্ত পুরী ত্যাগ করে চলে যাচ্ছো বলে।

*

আশা, তোমার নিঃসঙ্গ জীবনে একটা সাথী এনে দিলাম। খুশি হয়েছে?

হা।

যত্ন করে রেখো।

তুমি যাকে এনে দিলে তাকে আমি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসবো আর যত্ন করবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকবে এ ব্যাপারে। তোমার দেওয়া উপহার আমার পরম পাওয়া।

বনহুর এবার হুমায়রাকে লক্ষ্য করে বললো–কোনো সময় নিজকে অসহায় মনে করো না। আশা তোমার ভরসা। ও তোমার সাথী সঙ্গী সব মনে রেখো হুমায়রা।

তুমি আসবে না? বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো হুমায়রা।

আসবো। সময় পেলেই আসবো। আশাকে লক্ষ্য করে এবার বললো–আশা, এবার তাহলে চলি?

এসো। বললো আশা।

বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসলো।

হাত নাড়ছে আশা।

হুমায়রার গন্ড বেড়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

আশার চোখ দুটোও ছলছল করছিলো, অতি সাবধানে নিজকে সংযত করে রাখে সে। হঠাৎ তার দুর্বলতা যদি ঐ বাচ্চা মেয়েটার কাছে প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে নিজের মনের কথা অজান্তে প্রকাশিত হয়ে পড়বে ওর কাছে। আশা তার হৃদয়ের ব্যথা–বেদনা কাউকে জানতে দিতে চায় না। ভাবছিলো আশা অনেক কথা, যে কথাগুলো বনহুর একটু পূর্বে বলে গেলো তার কাছে। হুমায়রাকে সে ইচ্ছা করলে কান্দাই আস্তানায় নিয়ে যেতে পারতো কিন্তু কেন তা করেনি। হুমায়রা ছোট্টবেলা। হতে নিরিবিলি কাটিয়ে এসেছে। গভীর জঙ্গলে সে বড় হয়েছে, বনের পশু ওর সঙ্গী। ঝর্ণার পানি ওর সাথী। হুমায়রা ইন্দ্রনাথ নামধারী এক যুবককে হৃদয় সিংহাসনে স্থান দিয়েছে এ কথাও বনহুর বলেছে অতি সতর্কতার সঙ্গে কিন্তু ইন্দ্রনাথের আসল পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন করে গেছে বনহুর আশার কাছে। আশা নিজেও তো জীবনের চেয়ে বেশি ভালবেসেছে বনহুরকে কিন্তু সে তার বিনিময়ে কোনো প্রতিদান পায়নি,…..

হুমায়রা ডাকে–দিদি!

চমকে হাতের পিঠে চোখের পানি মুছে নিয়ে ফিরে তাকালো।

আমার কেউ নেই তুমি আমাকে আপন করে নেবে তো?

আশা হুমায়রাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো।

ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো আশার চোখ থেকে হুমায়রার মাথার ওপর।

ততক্ষণে তাজের খুরের শব্দ মিলিয়ে গেছে।

আশা হুমায়রার হাত ধরে নিয়ে এলো তার কুটিলে। নিজের আঁচলে চোখের পানি মুছে দিয়ে বললো–আজ থেকে তুমি আমার ছোট বোন, আমি তোমার দিদি।

সত্যি তোমাকে আমার বড় আপন বলে মনে হচ্ছে। আমি কোনোদিন তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।

ততক্ষণে বনহুর তাজের পিঠে উল্লাবেগে ছুটে চলেছে। অনেক দিন তাজ প্রভুকে নিজ আয়ত্তের মধ্যে পায়নি, আজ তাই সে মনের আনন্দে ছুটে চলেছে কান্দাই অভিমুখে।

কিন্তু কান্দাই পৌঁছবার পূর্বেই বাধাপ্রাপ্ত হলো বনহুর।

একদল অদ্ভুত পোশাক পরা লোক তাকে তীরধনুসহ ঘিরে ধরলো।

তাজসহ বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

চারদিকে তীরধনু উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য অদ্ভুত পোশাক পরা মানুষ। তাদের শরীরে বাঘের চামড়ার পোশাক, মাথায় বাঘের মাথার খুলির শিরস্ত্রাণ। অদ্ভুত চেহারা, বনহুর অশ্ব নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

এক পা বাড়ালেই চারপাশ থেকে তীর এসে বিদ্ধ হবে বনহুরের দেহে। কাজেই সে বেশ হকচকিয়ে গেলো, এরা কারা কিছুতেই বুঝতে পারলো না। আলগোছে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো।

তীর–ধনুধারিগণ দ্রুত এসে বনহুরের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। সবার হাতেই উদ্যত তীর ধনু। ওরা বনহুরকে বন্দী করে নিয়ে চললো।

তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা জানে না সে।

তাজ ওদের অনুসরণ করে চলেছে।

তীর-ধনুধারিগণ বনহুরকে রীতিমত কড়া প্রহরায় নিয়ে চলেছে। যদিও বনহুরের হাতে বা কোমরে কোনো রশি বা শিকল বাঁধা হয়নি তবু বনহুর কোনো রকম সুযোগ বা সুবিধা পাচ্ছে না। নিজকে মুক্ত করার। যদি শক্তহস্তে তীরধনু ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র থাকতো তাহলে বনহুরকে এতক্ষণ ধরে রাখা ওদের সাধ্য ছিলো না। তীর–ধনু যে কোনো অস্ত্রের চেয়ে মারাত্মক। বিষাক্ত তীর-ফলক একবার বনহুরের দেহে বিদ্ধ হয়েছিলো। তার কি সাংঘাতিক যন্ত্রণা, ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলো সেদিন বনহুর। কিন্তু সত্যিই তার সেদিন মৃত্যু ঘটেনি, যখন তার সংজ্ঞা ফিরে এসেছিলো তখন বনহুর বুঝতে পেরেছিলো সে এখনও জীবিত আছে তার মৃত্যু ঘটেনি।

সেদিনের কথাগুলো আজ বনহুরের স্পষ্ট মনে পড়ছিলো। সে কোনো যন্ত্রকে বনহুর আয়ত্তে আনতে পারে শুধু তীর-ধনুকে বনহুর সমীহ করে।

বহুক্ষণ ধরে বনহুরকে নিয়ে হেঁটে চললো ওরা। বনহুর অবশ্য মাঝে মাঝে সুযোগের সন্ধান করছিলো। তাকাচ্ছিলো সে তীর–ধনুধারীদের দিকে। বড় ভয়ংকর চেহারা এক একজনের। প্রত্যেকের শরীরে নানা ধরনের দেবদেবীর মূর্তি, চামড়া কেটে ক্ষত সৃষ্টি করে তৈরি করা হয়েছে।

বনহুর দুঃসাহসী কাজেই ভয় তার ছিলো না। তাকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া হোক তাজ তার সঙ্গে রয়েছে এটাই তার ভরসা তা ছাড়া আল্লাহ আছেন, অন্যায় সে করেনি, কাজেই নিশ্চিন্ত সে এ ব্যাপারে।

পথ যেন শেষ হয় না।

ওরা বনহুরের কথা বোঝে না, ঠিক তেমনি ওদের উচ্চারণও বনহুর বুঝতে পারে না।

বনহুর নীরবে চলছিলো।

ওরা মাঝে মাঝে অদ্ভুত ধরনের কথা বলছিলো। কি বলছিলো ওরাই জানে, ওরাই বোঝে।

সন্ধ্যার কাছাকাছি তীর–ধনুধারিগণ এমন এক জায়গায় এসে হাজির হলো যে স্থান বনহুরের বেশ পরিচিত বলে মনে হলো।

ঘন জঙ্গল।

সম্মুখে একটা পর্ণ কুটির।

চারপাশে ধূম্ররাশি কুন্ডলি পাকিয়ে ঘুরপাক খেয়ে বনভূমি আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো।

তীরধারিগণ বনহুরকে সতর্কতার সঙ্গে ঘিরে রেখেছে।

সম্মুখে যে তীর–ধনুধারী দন্ডায়মান ছিলো সে অদ্ভুত ধরনের শব্দ করলো।

বনহুর তাকিয়ে আছে ধূম্রাচ্ছন্ন কুটিরটার দিকে। কোথায় যেন এসেছে, এ স্থান এককালে তার বিশেষভাবে পরিচিত ছিলো কিন্তু ঠিক স্মরণ করতে পারছে না।

প্রথম তীর–ধনুধারী অদ্ভুত শব্দ করতেই কুটিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো শুভ্রবসনা এক নারীমূর্তি।

চমকে উঠলো বনহুর। যদিও চারদিক ধুম্রাচ্ছন্ন তবুও চিনতে বাকি রইলো না, বনহুর দেখলো ধুম্ররাশির মধ্যে এক দেবীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। অস্ফুট কণ্ঠে বললো–দুর্গেশ্বরী তুমি!

দূর্গেশ্বরীর চোখেমুখেও বিস্ময় ফুটে ওঠে।

ধুম্রকুণ্ডলির মধ্য হতে বেরিয়ে আসে আরও সামনে, প্রথমে তার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হয় না, শুধু আনন্দপ্লাবিত দৃষ্টি স্থির হয় বনহুরের মুখে। স্বর্গের চাঁদ বুঝি ধরায় নেমে এসেছে, দূর্গেশ্বরী এগিয়ে এসে নতজানু হয়ে করজোড়ে প্রণতি জানিয়ে বললো–দেবরাজ, তোমাকে ওরা বন্দী করে নিয়ে এসেছে। ওরা জানে না কে তুমি! কি তোমার পরিচয়।

বললো বনহুর–দূর্গেশ্বরী, আমি ভাবতেও পারিনি এভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

আমিও অবাক হয়েছি এ যেন আমার না চাইতে স্বর্গলাভ। এসো.......এসো আমার সঙ্গে।

যারা এতক্ষণ তীর–ধনু বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলো তারা তাদের হস্তস্থিত তীর–ধনু নামিয়ে নিয়েছে। সবার চোখেমুখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে। তারা বন্দী করে এনেছে অথচ বন্দীর প্রতি এত সহানুভূতি... ব্যাপার কি। ওরা ভাবছে তাদের রাণীমা বুঝি পাগল হয়ে গেছে অথবা নষ্ট চরিত্রা হয়ে যাচ্ছে। শত্রুর রূপ তাকে অভিভূত করেছে। দূর্গেশ্বরী বনহুরকে সঙ্গে করে কুটিরে প্রবেশ

অন্যান্য সবাই বিমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বনহুর কুটিরে প্রবেশ করে বিস্মিত হয়, যে মূর্তি সে দশ বছর পূর্বে দেখেছে দূর্গেশ্বরী আজও সেই মূর্তি অতি যত্নসহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করে চলেছে। সামনে একরাশ পুষ্পস্তূপ, ধূমায়িত ধূপরাশি। সমস্ত কুটির ধূম্ররাশিতে ধূমায়িত। দুর্গেশ্বরী বললো–দেবকুমার, জানতাম সাধনা বিফলে যাবে না। তুমি আসবেই আসবে......

বনহুরের দুচোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

একি আশ্চর্য, দুর্গেশ্বরী আজও তাকে ভোলেনি। সেই মূর্তি–বনহুরের প্রতিমূর্তি সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা করে সে......

কি ভাবছো দেবরাজ?

তোমার বিস্ময়কর আচরণে আমি স্তম্ভিত।

কারণ?

সামনে প্রাণহীন একটা প্রস্তর মূর্তি......আর তুমি তার ধ্যানে মগ্ন, সত্যি স্তম্ভিত হবার কথাই বটে। দূর্গেশ্বরী, তোমার দেহ–মনে বয়সের ছাপ পড়েছে কিন্তু তোমার এ সামান্য সংজ্ঞা–টুকু হয়নি যার জন্য তুমি সাধনা করে চলেছে সে এক অদ্ভুত কান্ড। যাক ও কথা, কিন্তু ওরা কারা যারনা আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে।

দূর্গেশ্বরী কিছু ভাবছিলো। বললো–তুমি জানো একদিন আমার অনেক কিছু ছিলো। শত শত অনুচর ছিলো আমার এরা তারাই।

এরা তোমার সেই অনুচরবর্গ।

হাঁ

কিন্তু....

তারা সবাই হিন্দোলবাসী।

হিন্দোলবাসী এরা? তোমার পুরানো অনুচর?

হাঁ

কিন্তু এরা তো সবাই নিজ নিজ কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলো বলেই জনতাম এবং তারা তোমার প্রদত্ত অর্থেই নানা ধরনের ব্যবসায়ে মনোযোগী হয়েছিলো!

সে কথা সত্য।

তোমার অগাধ ধনসম্পদ বিলিয়ে দিয়েছিলে তুমি?

সব দিয়েও আমি নিঃস্ব হতে পারিনি, কারণ আমার অফুরন্ত স্নেহভান্ডার আমাকে সজীব করে রেখেছিলো, তাই ওরা আমাকে ছেড়ে যেতে পারেনি। ওরা সর্বক্ষণ আমাকে বেষ্টন করে থাকতে

তাই বলে যাকে পাবে তাকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসবে, এটাই কি তোমার নির্দেশ?

এ নির্দেশ আমি না দিলেও ওরা এ নিয়ম পালন করে চলেছে। আমার সীমানার মধ্যে যারা প্রবেশ করে তাদেরকে ওরা বন্দী করে হাজির করে আমার সামনে।

আর তুমি তাদের হত্যা করো?

তুমি কি বিশ্বাস করো আমি পূর্বের মতই নির্দয় হৃদয়হীন আছি?

তার প্রমাণ কি বলল? আমাকে ওরা হত্যা করে লাশও হাজির করতে পারতো তোমার সামনে। হয়তো বা এমন অনেক ঘটেও থাকে।

সে কথা মিথ্যা নয়। ওরা বেশ কিছু লোককে অনর্থক হত্যা করেছে, কাজেই আমি এ ব্যাপারে ভীষণ দুঃখিত। ওরা অত্যন্ত অবুঝ আর অবুঝ বলেই তারা আজও আমাকে ত্যাগ করে চলে যায়নি।

আর তুমি তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছো?

তুমি যদি আমার পর্যায়ে পড়তে তাহলে তুমিও পারতে না বনহুর। এরা অত্যন্ত সৎ মহৎ এবং কর্তব্যপরায়ণ এবং সেই কারণেই আজও ওরা আমাকে ছেড়ে যেতে পারেনি। আমার রাজ্য ওরা পাহারা দেয়। কোনো শত্রু যেন আমার রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে। দেবরাজ, তোমাকে, ওরা আমার তপস্যাবলেই খুঁজে পেয়েছে। আমি পরম ভাগ্যবতী……কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো দূর্গেশ্বরী।

কুটিরের বাইরে প্রতীক্ষা করছিলো ওরা।

দূর্গেশ্বরী বাইরে বেরিয়ে আসতেই অসংখ্য তীরন্দাজ জংলী নতজানু হয়ে কুর্ণিশ জানালো দূর্গেশ্বরীকে। ওরা যাকে পাকড়াও করে এনেছে সে যে তাদের রাণীমার শ্রদ্ধার পাত্র তা তারা জানতো না, এ কারণে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। সবার চোখে মুখে একটা ভীতিকর ভাব লক্ষিত হচ্ছে।

দূর্গেশ্বরী একদিন দস্যুনেত্রী ছিলো আজ সে তাপসী। এতদিন যা সঞ্চয় করেছিল সব সে তার অনুচর এবং দুঃস্থ জংলীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া শহর অঞ্চলেও তার সীমাহীন দান রয়েছে।

দূর্গেশ্বরী নাম শুনলে এ অঞ্চলের মানুষ সবাই মাথা নত করে। এহেন দূর্গেশ্বরীকে ছাড়া কেউ যেন কিছু ভাবতে পারে না।

দূর্গেশ্বরী দেবী।

জংলীরা তাকে পূজা করে।

প্রতিদিন ঝুড়ি বোঝাই ফলমূল নিয়ে আসে জংলীরা দূর্গেশ্বরীকে উপহার দেওয়ার জন্য। ঘরে স্তূপ হয়ে যায় ফলমূলে।

দূর্গেশ্বরী তার ভক্তদের জংলীভাষায় বললো–তোমরা যাকে ধরে এনেছো সে আমার প্রিয়জন। তোমরা ফিরে যেতে পারো।

দূর্গেশ্বরীর কথা শুনে সবাই খুশি হলো এবং সবাই চলে গেলো যার যার কাজে।

দূর্গেশ্বরী যখন কুটিরের বাইরে তার ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলো তখন বনহুর কুটিরের মধ্যে নির্বাক নয়নে তাকিয়ে ছিলো জমকালো পোশাক পরিহিত প্রস্তুরমূর্তিটার দিকে। অবিকল তারই প্রতিচ্ছবি।

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে।

দূর্গেশ্বরী এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

বললো–হাসছো! জানো না এ প্রস্তরমূর্তি আমার শূন্য জীবনকে পূর্ণতায় ভরিয়ে রেখেছে। আমি একদিন মৃত্যুবরণ করেছিলাম কিন্তু আজ আমি মৃত নই।

দুর্গেশ্বরী, এ তোমার মনের অহেতুক বাসনা।

বনহুর, এ কথা তুমি বলো না। সবাই বলুক আমি সহ্য করবো কিন্তু তোমার......দুর্গেশ্বরী হঠাৎ বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বনহুর ওর পিঠে হাত রেখে বললো–ভাবতে পারিনি তুমি আজও আমাকে স্মরণ রেখেছে।

যতদিন বাঁচবো ততদিন তুমি আমার একমাত্র সাধনা......বনহুরের প্রশস্ত বুকখানা দূর্গে শরীর অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে উঠলো।

কঠিন প্রাণেও একটা দূর্বলতা অনুভব করলো বনহুর। কিন্তু সে সংযমী পুরুষ, নিজেকে সামলে নিলো। রাশিকৃত ধুম্রকুন্ডলির মধ্যে দূর্গেশ্বরীর অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলে ধরলো, তারপর বললো–এবার আমাকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দাও।

হাতের পিঠে চোখের অশ্রু মুছে নিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো–দিলাম, যাও তুমি!

বনহুর দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে এলো।

তার পাশে এসে দাঁড়ালো দূর্গেশ্বরী।

দুর্গেশ্বরীর নির্দেশ পেয়ে তার অনুচরগণ বিদায় গ্রহণ করেছিলো। বনহুর আর দুর্গেশ্বরী যখন বাইরে বেরিয়ে এলো তখন তারা অবাক হয়ে দেখলো বাইরে অপেক্ষা করছে তাজ।

বনহুরকে দেখামাত্র তাজ অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো–চি হি চি হি......

তাজ এগিয়ে এলো, বনহুর পিঠ চাপড়ে দিলো তাজের।

অদ্ভুত ভঙ্গীতে তাজ সম্মুখের পা দুটো উঁচু করে আদর জানালো।

বনহুর বললো–তাজ আমাকে নিতে এসেছে।

বললো দূর্গেশ্বরী–চলে যাবে তো এসেছিলে কেন?

এসেছিলাম নয়, বন্দী করে আনা হয়েছিলো।

দস্যসম্রাট তাহলে স্বীকার করেন তাকে বন্দী করার মত যোগ্যতা আরও অনেকের আছে?

হেসে বললো বনহুর–আছে তবে কৌশলে।

পৃথিবীর সব কাজই সমাধা হচ্ছে কৌশলে, কাজেই কৌশল ছাড়া কোনো কাজই হবে না।

মিথ্যা নয় দূর্গেশ্বরী, পৃথিবীটা আজ কৌশলের শিকার। তাই সবকিছুই কৌশলে করতে হয় এ কথা ধ্রুব সত্য। কৌশল করে হাতাঁকে বশে আনতে হয়, কৌশলে মানুষ চাঁদে যায়, কৌশলে একজনের ধন-সম্পদ আর একজন আত্মসাৎ করে, কৌশলে মানুষ হয়ে মানুষের রক্ত শুষে নেয়। কৌশল যারা জানে না তারা বোকা, তারা অধম। দূর্গেশ্বরী, তুমিই বলো কৌশল ছাড়া তুমি এতগুলো অসভ্য মানুষকে বশে আনতে পারতে? টাকা আর ভালবাসা দিয়ে কৌশলে তুমি এদের হাত করেছে। পৃথিবীতে আজ যারা সরল সহজ আর ন্যায়বান তারাই বোকা, আর যাদের আমরা চালাক বলি তারা হলো ধোকাবাজ, কুকর্মে অভ্যস্ত। একজন নিরীহ মানুষকে মেরে একজন কি করে বড় হবে, কি করে ধোকা দিয়ে

কৌশলে তার সর্বনাশ করবে......এসব কাজ যারা সচ্ছন্দে করে যাচ্ছে তারাই এ পৃথিবীতে চালাক তবে আমি তাদের বুদ্ধিমান বলবো না।

কারণ? বললো দূর্গেশ্বরী।

বুদ্ধিমান যারা তারা কোনোদিন অসং বা ধোকাবাজ হতে পারে না, কারণ ধোকাবাজি করে কেউ কোনো সময় চিরস্থায়ী হতে পারে না। তাদের ভিং ক্ষণস্থায়ী।

দূর্গেশ্বরী হেসে বললো–আজ পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকই ধোঁকাবাজি করে গাড়ি–বাড়ি, দালান–কোঠা ঐশ্বর্যের ইমারত গড়ে তুলছে, তুমি কি বলো এসব ক্ষণস্থায়ী?

হা সম্পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী। কারণ পৃথিবীতে আমরা যে সময়টুকু অবস্থান করি তা পৃথিবীর বয়সের তুলনায় তিল পরিমাণ অথবা এক সেকেন্ড বলতে পারে। এই সময়টুকু সত্যি বলতে কিছু নয়। তুমি পূর্বপুরুষদের জীবন স্মরণ করো, দেখবে যারা সভাবে জীবন যাপন করে গেছে তাদের বংশরগণ আজও সুনামের সঙ্গে পৃথিবীর বুকে বিরাজমান আর যারা কুকর্ম এবং অসৎ কাজে লিপ্ত ছিলো তাদের ইমারতের জীর্ণ কংকালগুলো কালের সাক্ষীস্বরূপ নতমস্তকে দাঁড়িয়ে পূর্বপুরুষদের অসৎ কর্মের সাক্ষ্য বহন করছে।...কথায় কথায় অন্য ধাপে গড়িয়ে পড়েছি। দূর্গেশ্বরী, কৌশলে তোমার অনুচরগণ বন্দী করে আমাকে এনেছিলো বলে তোমার সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হলাম। এবার আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে।

এতকথা তোমাকে কোনোদিন বলতে শুনিনি। আজ আমি ধন্য দেবরাজ। দূর্গেশ্বরী গলায় আঁচল জড়িয়ে নতজানু হয়ে বনহুরকে প্রণাম করলো।

বনহুর ওকে তুলে ধরে বললো–আবার দেখা হবে। চলি এবার......কথা শেষ করে বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসলো। .

দূর্গেশ্বরী হাত নাড়তে লাগলো।

বনহুরের অশ্ব চলে গেলো দৃষ্টির আড়ালে।

দূর্গেশ্বরী তখনও হাত নাড়ছে।

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এলো দূর্গেশ্বরীর।

সম্মুখে শূন্য।

তাজ আর বনহুর চলে গেছে দূরে বহু দূরে।

দূর্গেশ্বরীর গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো দুফোঁটা অশ্রু। মনে হচ্ছে সে বড় একা নিঃসঙ্গ, কেউ নেই তার।

দূর্গেশ্বরী ছুটে গেলো কক্ষে।

সম্মুখে বনহুরের প্রস্তরমূর্তি দন্ডায়মান।

দূপদানী থেকে ধূম্রকুন্ডলি ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত মূর্তিটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে! দূর্গেশ্বরীর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এসেছে। বনহুরের মুখখানা অস্পষ্ট লাগছে।

হঠাৎ কে যেন কাঁধে হাত রাখলো।

চমকে ফিরে তাকালো দূর্গেশ্বরী।

জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী, বললো–মা, মিথ্যা সাধনায় তুমি আত্মহারা। তুমি আল্লাহতালাকে ডাকো, তার সান্নিধ্য তোমার মনকে শান্ত করবে। যার সাধনা করছো তাকে কোনোদিন পাবে না।

বাবা!

হাঁ মা।

কে আপনি?

আমি নিজেই জানি না আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, আবার কোথায় যাবো। একদিন জন্মেছি একদিন মৃত্যু হবে। মৃত্যু এমন একটা জিনিস বা এমন একটা জায়গা যার কোনো ঠিকানা নেই।

বাবা!

মা, মৃত্যুর পর নাহি কোনো ডাকঘর। তাই আমরা যতদিন এ পৃথিবীতে বসবাস করছি ততদিনই আমাদের পরিচয় বা ঠিকানা। আমি সংসারত্যাগী এক পুরুষ, আল্লাহর সাধনা আমার ধ্যান জ্ঞান সাধনা।

দূর্গেশ্বরীর দুচোখে তখন অঝোরে অশ্রু ঝরছে।

*

গভীর রাতে বনহুরের শহরের আস্তানার দরবারকক্ষে একটা আলোচনাসভা বসেছে। চারদিক নিস্তব্ধ।

সমস্ত কান্দাই শহর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে।

মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে দুএকটা যানবাহনের ক্ষীণ শব্দ। কারণ বনহুরের শহরের আস্তানাটি সম্পূর্ণ ভূগর্ভে। শহরতলীর এক পোড়োবাড়ীর অভ্যন্তরে এই ভূগর্ভের সিঁড়িপথ। প্রকাশ্যে কেউ এ সিঁড়িপথের সন্ধান পাবে না।

ভূগর্ভ আস্তানার তলদেশে রয়েছে আরও একটা সুড়ঙ্গপথ। এই সুড়ঙ্গপথে শহরের যে কোনো অংশে যাওয়া যায়। এমনকি যানবাহন চলাচলেও কোনো অসুবিধা হয় না।

বনহুর তাজসহ শহরের আস্তানায় এসে হাজির হয়েছে। পূর্বে শহরের ভূগর্ভের আস্তানায় তেমন রহস্যজনক কোনো সুড়ঙ্গ–পথ ছিলো না। এখন যে সুড়ঙ্গপথ তৈরি হয়েছে তা অতি বিস্ময়কর।

বনহুর ইচ্ছামত এ সুড়ঙ্গপথে কান্দাই–এর সর্বস্থানে যাওয়া আসা করতে পারে। ইচ্ছামত কাজ করতে তার কোনো অসুবিধা না হয়। শহরের আস্তানার গভীর তলদেশে বহুস্থান জুড়ে অনুচরদের আবাসস্থল তৈরি করা হয়েছে। এখানে বনহুরের বহু বিশ্বস্ত অনুচর ট্রেনিংপ্রাপ্ত হচ্ছে। যদি কোনো মুহূর্তে দেশে অরাজকতা অথবা শৃঙখলাহীন কার্যকলাপ প্রচন্ডভাবে আলোড়ন জাগায় তখন এই দক্ষ অনুচরগণ বনহুরের পাশে থেকে তারা যেন নিঃসহায় জনগণের রক্ষার্থে এগিয়ে আসতে পারে।

বনহুর কান্দাই আস্তানায় যাওয়ার পরই জানতে পারে ইটালী শহর ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হয়েছে। বহু দালানকোঠা ভূগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

পৃথিবীতে এমন ভীষণ ভূমিকম্প আর হয়েছে কিনা সন্দেহ। বহু লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। এখনও নাকি অনেক জায়গায় ভূগর্ভে ধসে পড়া দালানকোঠার তলদেশে বহুলোক আটকা পড়ে আছে।

ইটালী সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে এইসব আহত–নিহত গলিত মনুষ্যদেহ উদ্ধারকার্য চালিয়ে চলেছেন।

কিন্তু এমন কোনো একস্থানে একটা বিরাট বাড়ি ভূগর্ভে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়েছে যে বাড়ির ছাদখানা শুধু ভূপৃষ্ঠে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ইটালীর জনগণ সন্দেহ করছে এই অট্টালিকার তলদেশে আজও বহু লোক জীবন্ত অবস্থায় আটকা পড়ে আছে। বহু রাতে শহর যখন নির্জন হয়ে যায় তখন ভূগর্ভ থেকে শোনা যায় নারীপুরুষের করুণ আর্তনাদ।

বহু ভূতত্ত্ববিদ নানাভাবে গবেষণা চালিয়েও এই অসহায় মানুষগুলোকে উদ্ধারের কোনো ব্যবস্থা করতে পারছেন না।

বনহুর গভীর মনোযোগ সহকারে সব শুনলো তারপর সে বললো–রহমান, প্রস্তুত হয়ে নাও, তোমাকেও আমার সঙ্গে ইটালীতে যেতে হবে।

সর্দার!

হাঁ, এ সংবাদ শোনার পর চুপ থাকা যায় না।

কিন্তু আমরা কি উপায়ে ভূগর্ভ থেকে আটকে পড়া মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে পারি? কারণ আমরা কোনো মেশিন নিয়ে যেতে পারছি না যা দিয়ে গভীর মাটির তলদেশে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

কান্দাই বিমান বন্দর হতে বিরাট মালবাহী বিমান হিন্দোল বিমান বন্দর অভিমুখে যাত্রা করবে। এ বিমানে আমি নিজে চালক হিসেবে থাকব। আমি জানি ঐ বিমানে সেদিন একটা বিরাট বাক্সে একটা মেশিন হিলে যাচ্ছে। আমি সেই বাক্সে ঐ মেশিনের পরিবর্তে আমার সুড়ঙ্গ খনন মেশিনটা তুলে নেবো এবং হিন্দোল না গিয়ে আমি বিমানটাকে ইটালী বিমান বন্দরে অবতরণ করাবো।

সর্দার হঠাৎ যদি……

কেউ জানতে পারে?

তাহলে নতুন কোনো বিপদ আসতে পারে।

তুমি কি জানো না বিপদের সঙ্গে মোকাবেলা করাই আমার নেশা।

জানি!

তবে কেন ঘাবড়ে যাচ্ছো রহমান?

সর্দার আপনার জন্য……

আমার জন্য ভেবো না, মরতে হলে এক বারই মরবো, বারবার মরতে হবে না, কাজেই মৃত্যুভয় কোনোদিন আমাকে দূর্বল করতে পারেনি, আজও পারবে না। ইনশাআল্লা আমি জয়যুক্ত হবোই……মহসীন!

বলুন সর্দার?

দিপালী কোথায়? ও কেমন আছে?

ভাল আছে।

শোন মহসীন, তোমাকেও হয়তো যেতে হবে আমার সঙ্গে।

আমি প্রস্তুত আছি সর্দার।

রহমান কিছু বলবে বলে বারবার মাথা তুলছিলো কিন্তু বলবার সাহস পাচ্ছিলো না।

বনহুর বুঝতে পারে তার মনোভাব, তাই বললো–কিছু বলবে?

সর্দার, আমাদের মেশিন অত্যন্ত ভারী কাজেই তা বহন করা….

এ কারণেই ভারবাহী বিমান ব্যবহার করবো। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে নিতে পারবে বলে আশা করছি।

*

পাইলটের মুখের কালো রুমালখানা খুলে দিয়ে হাত ও পা শৃঙ্খলমুক্ত করলো বনহুর, তারপর বললো–এই নিন আপনার ড্রেস, এবার আপনার ছুটি।

পাইলট ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। তিনি কিছু বুঝতে পারছেন না। হঠাৎ কি ঘটে গেলো তাও বুঝতে পারেননি। অন্যান্য পাইলটের সঙ্গে কফি পান করছিলেন, তারপর কিছু মনে নেই।

হঠাৎ নিজেকে বিমানের খোলসের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পেয়ে শুধু বিস্মিতই হননি, একেবারে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি।

এতক্ষণে বনহুর যখন সব খুলে বললো তখন পাইলট সব অনুধাবন করলেন। তাঁকে কফির সঙ্গে কোনো ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিলো যার জন্য তিনি সংজ্ঞালুপ্ত হয়ে পড়েছিলেন।

এবার পরে নিলেন পাইলট নিজের পরিচ্ছদ।

এবং বিমান বন্দরে পুলিশমহলকে বিস্তারিত সব জানালেন কিন্তু যে বিমান বন্দরে তাদের বিমান অবতরণ করার কথা ছিলো, এ বিমান বন্দর তো সেটা নয়– এ তো সম্পূর্ণ আলাদা।

পাইলট কেমন যেন সব বেখেয়াল দেখছেন।

কেমন করে এমন হলো!

কে তাকে তার পোশাক এগিয়ে দিয়ে পতে বললো। কে এই ব্যক্তি?

ততক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে, সেই অজানা ব্যক্তিটির কোনো সন্ধানই আর পেলেন না পাইলট এবং বিমানটার অন্যান্য চালক যারা সহকারীরূপে পাশে ছিলেন।

অত্যন্ত কৌশলে বনহুর এ কাজ সমাধা করলো। বনহুর নিজে নির্জন এক জায়গা বেছে নিলো সুড়ঙ্গপথ তৈরি করার জন্য। এ সুড়ঙ্গপথ গভীর মাটির তল দিয়ে চলে যাবে একেবারে যেখানে আটকে পড়েছে হাজার হাজার নারী–পুরুষ আর শিশু। কেউ জানে না তারা জীবিত আছে না মৃত্যুবরণ করেছে।

বনহুর ইটালীয়ান শ্রমিকের বেশে ইটালীয়ান সৈনিকদের সঙ্গে মিশে কাজ করতে লাগলো। ওদিকে চললো সুড়ঙ্গ খনন। রহমান এই অনুচরদের পরিচালনা করে চললো। এদিকে পত্রিকায় প্রকাশিত হলো ভারবাহী বিমান হাইজ্যাক ব্যাপারের বিভিন্ন ধরনের কাহিনী। চক্ষু স্থির হলো সবার, এমন ঘটনা তারা জীবনে দেখেনি কিংবা শোনেনি।

তবে আজকাল বিমান হাইজ্যাক ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে বিস্ময়ের তেমন কিছু নেই।

তবুও এ বিমান হাইজ্যাক সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের।

ইটালীর অবস্থা মহা ভূমিকম্পে একেবারে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। চারদিকে ধসে পড়া অট্টালিকা একেবারে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। চারদিকে ধসে পড়া অট্টালিকা বিভীষিকাময় দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। শুধু কান্নার রোল, আর বিলাপধ্বনি।

এই দৃশ্যে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়।

শুধু মৃতদেহ আর পচা মাংসের বীভৎস গন্ধ।

উদ্ধারকারিগণ নাকে মোটা রুমাল বেঁধে গলিত লাশ উদ্ধার কার্যে ব্যস্ত। বিদেশ থেকে এসেছেন বিভিন্ন সংস্থা সমিতি এবং নানা প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকগণ।

সরকার বাহিনীর লোকজন বিভিন্ন ধরনের মেশিনের সাহায্যে ধসে পড়া দালানকোঠা সরিয়ে ফেলছেন এবং বের করছেন শত শত লাশ।

এদের মধ্যে মিশে গেলো দস্যু বনহুর।

সুড়ঙ্গ খননের কাজে তার সহকারী যারা এসেছে তাদের লাগিয়ে দিয়েছে সে সুড়ঙ্গ খনন কাজে। চলেছে সুড়ঙ্গ তৈরি, একেবারে সেই গভীর তলদেশে আটকে পড়া অসহায় মানুষগুলোর উদ্ধারের জন্য।

সুন্দর মুখখানা বনহুরের রক্তাভ হয়ে উঠেছে।

কতকগুলো শ্রমিক মিলে কাজ করছিলো, বনহুরও ছিলো তাদের সঙ্গে। ধূলোবালিতে একাকার তার দেহ।

যে জায়গাটায় বনহুর কাজ করছিলো সে জায়গাটায় ভূগর্ভে ধসে পড়েছিলো বিরাট সেই অট্টালিকাটা। যার অভ্যন্তর থেকে এখনও শোনা যাচ্ছে করুণ আর্তনাদ ও গোঙ্গানির শব্দ।

বনহুর একটা পাথর সরানোর চেষ্টা করছিলো এমন সময় তার কাঁধে কেউ হাত রাখলো।

ফিরে তাকালো বনহুর।

একটা তরুণ তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার গম্ভীর ভাব।

বনহুর বললো–কে তুমি?

তরুণ জবাব দিলো–চিনতে পারেনি তাহলে?

তুমি গেছো ইংরেজ বণিকদের সন্ধানে, কি করে বিশ্বাস করবো তুমি এখানে?

ইংরেজরা তাদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে তার পূর্বেই জাহাজ নিয়ে বিদায় হয়েছে। শুনলাম ইটালীর ভয়াবহ ভূমিকম্পের কথা–নিশ্চুপ থাকতে পারলাম না। যদি কোনো উপকার করতে পারি তাই এলাম।

তাহলে উদ্দেশ্য আমাদের এক, কি বলো রাণী?

হাঁ। এবং সে কারণেই তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে গেলো। অবশ্য আমি তোমার প্লেনেই এসেছি……

বিস্ময়ভরা চোখে তাকালো বনহুর রাণীর দিকে।

বললো রাণী– আমি জানতাম যে কোনো মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে তোমার জন্য, তাই সজাগ ছিলাম যেন কোনো মুহূর্তে অন্যমনস্ক না হই।

ধন্যবাদ রাণী। আমার চোখে তুমি ধূলো দিয়ে আমার বিমানেই এসেছে।

না এসে পারলাম না।

সত্যি পুরুষের ড্রেসে তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না। যাক এবার কাজ করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। একসঙ্গে মিলিতভাবেই কাজ করবো। মিঃ আহাদ চৌধুরীর সংবাদ কি বলো? তার। খবর জানি না বহুদিন।

বললো রাণী–চৌধুরী গেছেন মণিষা দ্বীপে।

মণিষা দ্বীপ!

হাঁ।

ঐ দ্বীপে আমার যাওয়ার কথা ছিলো কিন্তু ভাগ্যক্রমে হয়ে ওঠেনি। মিঃ চৌধুরী গেছেন শুনে আশ্বস্ত হলাম।

রাণীর মুখখানা কেমন যেন ভাবাপন্ন হয়ে উঠলো, বললো–যাবার পর হতে তার কোনো সংবাদ জানি না। বড় চিন্তাযুক্ত আছি।

বনহুর হেসে বললো–চিন্তার কোনো কারণ নেই। মিঃ চৌধুরী চতুর ব্যক্তি, তিনি বিপদকে পরিহার করে চলবেন। তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই সাহসী সাথী রয়েছেন।

হাঁ আছে। সমীর কুমার এবং হায়দার আলী রয়েছে তার সঙ্গে।

এমন কিছু ঘটেনি যার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে।

বনহুর আর রাণী কথা বলছিলো, সেই মুহূর্তে একজন অনুচর ছুটে এলো– সর্দার, আমাদের সুড়ঙ্গ খনন কাজ শেষ হয়েছে। আমরা ঠিক ঐ স্থানে গিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি যেখানে অসংখ্য নারী–পুরুষ আটকা পড়েছে……

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করা উচিত হবে না। চলো রাণী, আমার সঙ্গে চলো।

চলো বনহুর।

বনহুর আর রাণী সংবাদবাহকের সঙ্গে ছুটলো।

এদিকে শত শত উদ্ধারকারী উদ্ধারকার্য চালিয়ে চলেছে। কারও নাকে রুমাল বাধা, কারও মাথায় মুখে কাপড় জড়ানো। নানা ধরনের লোকজন বড় বড় দালানকোঠার খনন কাজ চালিয়ে চলেছে।

অগণিত নরনারীর কান্নারোলে ভরে উঠেছে চারদিক। মাতম জারিতে বাতাস করুণ হয়ে উঠেছে।

বনহুর আর রাণী সংবাদবাহকের সঙ্গে চলেছে। চারদিকে ভগ্নস্তূপ, ইট পাথর আর মানুষের মৃতদেহের ছড়াছড়ি।

ছুটে যেতেও বারবার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলো বনহুর আর রাণী।

তবে বেশিক্ষণ লাগলো না তাদের সুড়ঙ্গমুখে পৌঁছতে। সুড়ঙ্গমুখ তৈরি হয়ে গেছে, সুড়ঙ্গ সোজা চলে গেছে গভীর মাটির তলায়।

বনহুর আর রাণী প্রবেশ করলো সুড়ঙ্গে। কিছু দূর চলার পর তাদের নাকে তীব্র দুর্গন্ধ এসে লাগছে। ভীষণ উৎকট গন্ধ বনহুর আর রাণী নাকে রুমাল বেঁধে নিলো। বনহুরের হাতে টর্চলাইট, আলো ফেলে এগুচ্ছে। বিরাট একটা সার্চলাইট খননকারী মেশিনের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে।

এই আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সুড়ঙ্গের চারদিক।

বনহুর তবুও টর্চের আলো ফেলে সবকিছু লক্ষ্য করছিলো। ভীষণ আর ভয়াবহ দৃশ্য। বহু লাশ চাপা পড়ে আছে ইটের দেয়ালের চাপের নিচে। কারও হাত বা পা, কারও পিঠ বা বুক বেরিয়ে আছে। সে কি মর্মান্তিক দৃশ্য।

রাণী দুহাতে চোখ ঢাকলো।

বনহুর বললো–এর চেয়েও ভয়াবহ দৃশ্য হয়তো আমাদের দেখতে হবে।

দস্যুরাণীর চোখেমুখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে। তার বিশ্বাস হচ্ছে না কি করে বনহুর এই অসাধ্য সাধন করেছে। এতবড় ভারী সুড়ঙ্গ মেশিনটা কেমন করে সুদূর কান্দাই থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে ইটালীতে নিয়ে এলো আর সেই মেশিনে শত শত ফুট গভীর মাটির তলায় পাথর ভেঙ্গে সুড়ঙ্গপথ তৈরি করে চলেছে। এমন কি কঠিন পাথর কেটেও সুড়ঙ্গ তৈরি সমাধা হয়েছে।

হঠাৎ রাণীর চিন্তাধারায় বাঁধা পড়লো।

মানুষের গোঙ্গানির শব্দ কানে এলো তার।

রাণী বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো–দেখেছো বনহুর তোমার সাধনা সফল হয়েছে। আমরা সুড়ঙ্গপথে ঠিক জায়গার কাছাকাছি এসে গেছি।

হাঁ রাণী, তোমার সহযোগিতা আমাকে প্রেরণা যোগাবে।

আমি জানতাম তুমি অসাধ্য সাধন করতে অদ্বিতীয়। শোনো কান্নার শব্দ কত স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

বনহুর ততক্ষণে পাথর সরাচ্ছে।

বেরিয়ে এলো একটা কক্ষ।

বিরাট প্রশস্ত কক্ষ।

কক্ষটা অক্ষত রয়েছে, শুধু তাই নয়, পরপর কয়েকটা তলার তেমন কোনো ক্ষতি সাধন হয়নি, শুধু দেবে গেছে মাটির তলায়।

বনহুর এসব কক্ষে অনুচরদের প্রবেশের অনুমতি দিলো এবং নিজেও রাণীকে নিয়ে প্রবেশ করলো। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো তারা। আজ প্রায় দীর্ঘ দুমাস ধরে তারা আটকা পড়ে আছে। ছাদের ভগ্ন অংশ দিয়ে পৃথিবীর কিঞ্চিৎ আলো বাতাস প্রবেশ করায় আজ পর্যন্ত ওরা অনেকে বেঁচে আছে। যারা বৃদ্ধ অথবা শিশু কিংবা দূর্বল তারা মৃত্যুবরণ করেছে। আর যারা বেঁচে আছে তারা মৃতপ্রায়। জীবন্ত কংকাল বললে ভুল হবে না।

বনহুর ও রাণী এবং তাদের সঙ্গীরা সবাই প্রবেশ করলো ভগ্নাংশ দিয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলোর মধ্যে। সবারই চক্ষুস্থির, জীবিত সুস্থ মানুষ তারা কতদিন দেখেনি। আজ তারা অসহায় করুণ মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখলো জীবন্ত সজীব মানুষ।

ওরা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে বনহুর, রাণী আর তাদের সঙ্গীদের দিকে। ওরা এত জীর্ণ এবং ক্ষুধার্ত যে, যা কিছু হোক খেতে ওদের দ্বিধা নেই।

এক কক্ষে দেখা গেলো প্রায় চল্লিশ জন জীবিত মানুষ আর মৃত ব্যক্তির সংখ্যা আরও অধিক। মানুষের পচা গন্ধে নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসতে চায়।

দস্যুরাণী বললো–দেখো দেখো……

বনহুর তাকালো একপাশে।

কতকগুলো কংকালসার লোক একটা সদ্যমৃত লাশ খাচ্ছে।

বনহুর বলে উঠলো–নির্মম এ দৃশ্য….এরা এতদিন লাশের পচা মাংস খেয়ে বেঁচে আছে……

রাণী বললো–আর বিলম্ব করা উচিত হবে না।

হাঁ, এদের সবাইকে সুড়ঙ্গপথে বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করাই সমীচীন। বনহুর অনুচরদের নির্দেশ দিলো। রাণীর অনুচরও কিছু ছিলো, সবাই মিলে এই জীর্ণ কংকালসার মানুষগুলোকে বের করে নিয়ে চললো।

কতকগুলো কংকালসার মানুষের মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটেছিলো, তারা বনহুরের লোকজনদের কামড়াতে যাচ্ছিলো।

বনহুর আর রাণী মিলে এদের হাতগুলো পিছমোড়া করে বেঁধে দিলো, তারপর এক একজনকে কাঁধে উঠিয়ে সুড়ঙ্গ খননকারী মেশিনের খোলসে ভরে পৃথিবীর দিকে নিয়ে চললো।

প্রথম তলার মানুষগুলোকে সরানোর পর বনহুর ও রাণী অনুচরদের নিয়ে দোতলার কক্ষে প্রবেশের চেষ্টা চালালো। কিন্তু এ কক্ষের কোনো ভগ্নাংশ পাওয়া গেলো না। অতি কষ্টে মেশিন দ্বারা পথ বের করা হলো দেয়াল কেটে।

কিন্তু বিফল হলো সবাই।

এ কক্ষ শুধু পচা নয়, একেবারে বিষাক্ত গন্ধে ভরপুর। সার্চলাইট ফেলে যে দৃশ্য তারা দেখতে পেলো তা অতি ভয়ংকর। শুধু ভয়ংকর নয়, ভয়াবহ। সারি সারি গলিত লাশের স্তূপ। গলিত লাশের স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়লো না।

একটা মানুষও জীবিত নেই এ কক্ষে।

কক্ষটা ভালভাবে পরীক্ষা করে বনহুর দেখলো কক্ষের এক পাশের ছাদের কিছু অংশ ধসে পড়েছে কিন্তু সে পথে কোনো আলো–বাতাস প্রবেশ করেনি বা করতে পারেনি।

বনহুর আর রাণী নিজেরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো।

কারণ তারা এমনভাবে মুখ নাক বেঁধে নিয়ে ছিলো যে, তখন কথা বলার মত অবস্থা তাদের ছিলো না।

অতি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসা ছাড়া উপায় ছিলো না তাদের।

সবাই ওরা বেরিয়ে এলো।

পৃথিবীর মুক্ত বাতাসে কিছুক্ষণের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে উঠলো বনহুর, রাণী ও তাদের অনুচরবর্গ।

এখানেই একটা বড় টিলার ছায়ায় রাখা হয়েছিলো সেই আটকেপড়া জীর্ণ কংকালসার মানুষগুলোকে। তারা ক্ষুধার জ্বালায় আর্তনাদ করছিলো। এতদিন তারা শুধু মানুষের পচা মাংস খেয়ে বেঁচে আছে।

রাণী বললো–শীঘ্র এদের খাবার এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা দরকার। গলিত পচা মাংস খেয়েও যে এরা এখনও প্রাণে বেঁচে আছে আশ্চর্য।

আশ্চর্য কিছু নয় রাণী। অমন অবস্থায় পড়লে সবাই প্রাণ রক্ষার জন্য...... যাক ও সব কথা, এখন তাড়াতাড়ি এদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আরও একটা কথা, যাদের উদ্ধার করা হয়েছে এরা ছাড়াও এখনও শত শত ব্যক্তি হয় মৃত্যুবরণ করেছে, নয় এখনও পচা গলিত মাংস খেয়ে বেঁচে আছে। কারণ এ সুড়ঙ্গ খনন করবার পূর্বে আমি জেনে নিয়েছি এখানে যে অট্টালিকা ভূগর্ভে ধসে গেছে সেটা ছিলো একুশ তলা। সেই অট্টালিকায় বসবাস করতে কয়েক হাজার মানুষ।

থামলো বনহুর, হয়তো যা কিছু পূর্বে দেখা দৃশ্যগুলোই ভাসছে তার চোখের সামনে। হয়তো বা এমন ধরনের অনেক কক্ষে এখনও আটকে পড়া লোকজন পচা গলিত মাংস খাচ্ছে। বনহুরকে ভাবতে দেখে বললো রাণী–জানি এদের চিকিৎসা এবং খাদ্যের দরকার।

হাঁ রাণী, তুমি এদের খাদ্যের এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করো। রহমান এবং আমার কিছু অনুচর তোমাকে সাহায্য করবে। আর আমি আরও গভীরে যেতে চাই, কারণ তুমি শুনেছো এই অট্টালিকা একুশতলা বিশিষ্ট। কাজেই ভূগর্ভে এখনও বহুলোক আটক অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুণছে।

বেশ, তুমি যা বলবে আমি তাতেই রাজি। কারণ যাদের আমরা উদ্ধার করেছি তাদের বাঁচাতেই হবে।

*

দস্যুরাণী পুরুষের পোশাক ত্যাগ করে একটা ইটালীয়ান মহিলার পোশাক পরলো। ইটালীয়ান ভাষা তার জানা ছিলো, সেই ভাষা ব্যবহার করতে লাগলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হসপিটালের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিলো। এম্বুলেন্স এলো, নিয়ে চললো এই সব উদ্ধারকৃত নর–নারীকে।

সে এক মহান দৃশ্য।

রাণী নিজে কাঁধে করে এইসব জীর্ণ কংকালসার মানুষগুলোকে এম্বুলেন্সে তুলে দিতে লাগলো। সুচিকিৎসার কোনো ত্রুটি হলো না।

হসপিটালে নিজে গেলো রাণী এবং এইসব অসহায় করুণ অবস্থার মানুষগুলোর সেবাযত্ন নার্সদের সঙ্গে মিলে সে নিজেও করতে লাগলো।

একটা পাগলপ্রায় লোককে নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়লো রাণী। লোকটা উচ্চশিক্ষিত, নিশ্চয়ই কোনো বড় চাকরি করতো। তার জীর্ণ চেহারার মধ্যে ফুটে উঠেছে একটা করুণ বিষাদের ছায়া। বারবার সে রীমু রীমু বলে কাউকে ডাকছে।

লোকটাকে শয্যায় শয়ন করে দেবার পরও তাকে কিছুতেই শান্ত করা সম্ভব হচ্ছিলো না। মাঝে মাঝেই সে বলছে, রীমু, রীমু তুমি কোথায়? রীমু চলে এসো আমি বেঁচে আছি…রীমু চলে এসো আমি বেঁচে আছি…

নার্সরা তাকে কিছুতেই থামাতে পারছে না, বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ছে।

একজন নার্স ছুটে এসে বললো রাণীকে, রাণী তখন একটা অসুস্থ রোগীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলো।

বললো নার্স–বোন, সেই রোগী বেশি উতলা হয়ে পড়েছে। রীমু রীমু বলে চীৎকার করছে। চলুন, আমরা তাকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছি না।

রাণীর কানে কথাটা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটলো পূর্বের সেই রোগীর পাশে। লোকটাকে ধরে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে বললো রাণী–আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

তুমি এসেছো রীমু! তুমি এসেছো……

লোকটার চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো।

দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো লোকটা রাণীকে।

রাণী বললো–ছেড়ে দিন।

না, তুমি রীমু! আমার রীমু…আমি তোমাকে ছাড়বো না। তোমাকে আমি কোথাও যেতে দেবো না……।

শেষ পর্যন্ত রাণী বলতে বলতে বাধ্য হলো–হাঁ, আমিই রীমু……

সত্যি তুমি বেঁচে আছো?

এই তো দেখছো আমি বেঁচে আছি। রাণী কথাটা বললো, না বলে কোনো উপায় ছিলো না।

লোকটা শান্ত হলো।

রাণী ওর মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে শোবার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগলো।

লোকটার কথায় এবং তার হাবভাবে রাণী বুঝতে পারলো, তার প্রিয় স্ত্রীর নাম ছিলো রীমু এবং রীমুকে হারিয়ে সে উন্মাদ হয়ে গেছে। রাণী ধীরে ধীরে লোকটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

লোকটা ধীরে ধীরে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো।

রাণী এবার সযত্নে ওর শরীরে চাদর ঢাকা দিলো। তারপর সে এগিয়ে গেলো অপর আর একটা অসুস্থ মানুষের দিকে।

অন্যান্য নার্স সবাই আহত রোগীদের নিয়ে ব্যস্ত।

এই ভয়াবহ ভূমিকম্প ইটালীবাসীদের জীবনে এনে দিলো চরম এক বিপর্যয়।

লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ গৃহহারা, আত্মীয়–স্বজনহারা, এমনকি মাথা গুঁজবার ঠাইটুকুও নেই।

যে হসপিটালগুলো ভূমিকম্পের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছিল সে সব হসপিটাল ভর্তি হয়ে গেছে ভূমিকম্পের আহত নর-নারীতে।

রাণী যখন একটা রোগী নিয়ে ব্যস্ত ছিলো সেই মুহূর্তে হঠাৎ চীৎকার করে জেগে উঠলো সেই ভদ্রলোক–রীমু…রীমু কোথায় তুমি…।

রাণী বাধ্য হয়ে ছুটে গেলো তার পাশে।

এই তো আমি আছি….

কোথায় গিয়েছিলে রীমু? আমাকে একা ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

এই তো আমি তোমার পাশে আছি…..রাণী পাশে বসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

নার্স দুধ নিয়ে এলো।

বললো নার্স–নিন একটু খেয়ে নিন।

না, আপনার হাতে খাবো না। আমার রীমু আমাকে খাইয়ে দিক।

অগত্যা রাণী নার্সের হাত থেকে দুধের গেলাস নিয়ে ওর মুখে তুলে ধরলো।

ও দুধটুকু খেলো।

এমনভাবে ও রাণীকে রীমু বানিয়ে নিলো।

রাণীও অন্যান্য রোগীর সেবাযত্নের মধ্যে ওর প্রতি লক্ষ্য দিয়ে চললো বেশি।

এদের হসপিটালে রেখে ফিরে যাবে তা আর হলো না রাণীর। সে বাধ্য হলো এই মৃতপ্রায় লোকগুলোর সেবাযত্নের কাজে। বিশেষ করে ঐ ব্যক্তি যে রীমু পাগল, তার কাছ থেকে সরে যাবার উপায় নেই। একটু সরেছে না অমনি রীমু তুমি কোথায়? এসো আমার পাশে। হয় হাত না হয় কাপড়ে ধরে থাকবে এঁটে! এমন কি রাণীর হাত ছাড়া ওষুধপত্র কিছু খাবে না সে।

রাণী মুস্কিলে পড়লো।

সে অনুচরদের পাঠিয়ে দিলো বনহুর ও তার অনুচরদের সাহায্য করতে। এবং এখানের অবস্থা জানিয়ে একটা ছোট্ট চিঠি লিখলো বনহুরের কাছে।

বনহুর তখন ভীষণ ব্যস্ত সুড়ঙ্গ খনন কাজ নিয়ে। কারণ নিজে সে মেশিন চালিয়ে চলেছে, যেমন করে হোক এই একুশতলা বিশিষ্ট কক্ষগুলোর প্রত্যেকটার ভিতরে সন্ধান চালাবে সে।

বনহুর যা ভাবে অসাধ্য হলেও তা সে করে।

এ ব্যাপারেও তার সে প্রচেষ্টার শেষ নেই। একটার পর একটা কক্ষের দেয়াল খনন করে প্রবেশ করতে লাগলো বনহুর।

*

বনহুর জয়যুক্ত হলো কিন্তু প্রতিটা কক্ষেই নিঃশেষিত গলিত লাশ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়লো না তার। একেবারে শেষ তলার দিকে একটা কক্ষের ভিতর থেকে করুণ আর্তকণ্ঠ শোনা যাচ্ছিলো।

আশায় বনহুরের চোখমুখ খুশিতে ভরে উঠলো। কারণ হয়তো কিছু জীবিত লোক এখানে এই কক্ষের ভিতরে আটক অবস্থায় পাওয়া যাবে।

বনহুরের চিন্তাধারা সত্য হলো।

সুড়ঙ্গ খনন মেশিন দিয়ে সেই কক্ষের ভূগর্ভে দেবে যাওয়া দেয়াল ভেঙে ফেলে ভিতরে প্রবেশ করলো। ভিতরে প্রবেশ করার পূর্বেই অন্যান্য কক্ষের মত এ কক্ষেও একটা উৎকট গন্ধ নাকে প্রবেশ করলো। সেকি ভীষণ পচা মাংসের গন্ধ!

বনহুর খুব করে নাকমুখ বেঁধে নিয়ে অন্যান্য অনুচরকে নাক মুখ বেঁধে নিতে বললো, তারপর কক্ষে প্রবেশ করে যে দৃশ্য দেখলো তা অতি মর্মান্তিক এবং ভয়ংকর। কয়েকটা জীবন্ত কংকাল একটা অর্ধমৃত মানুষকে কামড়ে খাচ্ছে।

অর্ধমৃত মানুষটা করুণ আর যন্ত্রণাকাতর ভাবে চীৎকার করছে। যে করুণ আর্তকণ্ঠের আওয়াজ এতক্ষণ শোনা যাচ্ছিলো। সেকি ভীষণ দৃশ্য, বনহুর আর তার অনুচরগণ যারা কক্ষটার ভিতরে প্রবেশ করেছিলো তারা দুহাতে চোখ ঢেকে ফেললো।

বনহুর চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললো–ওকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নাও এবং তোমাদের সঙ্গে যে ফলমূল আছে সবার মধ্যে ফেলে দাও, নাহলে লোকটাকে উদ্ধার করা যাবে না। দেখছো না এ কক্ষে একটাও মাংসযুক্ত কংকাল নেই। সব এরা খেয়ে আজও বেঁচে আছে।

একজন অনুচর বলে উঠলো–কি আশ্চর্য! মানুষের মাংস মানুষ খেতে পারে।

বললো বনহুর–মানুষ যখন ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে ওঠে তখন হিংস্র জন্তুর চেয়েও ভয়ংকর হয়। এরা ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় হিংস্র হয়ে উঠেছে। যা পাবে তাই খেয়ে জীবন রক্ষার চেষ্টা করবে।

ততক্ষণ রাশিকৃত ফল এনে কংকালসার মানুষগুলোর সামনে ঢেলে দেওয়া হলো। তারা। শিয়াল কুকুরের মত ব্যগ্রতার সংগে ফলগুলো তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলো।

বনহুর ক্ষতবিক্ষত মৃতপ্রায় লোকটাকে সরিয়ে নিলো। তার দেহের ক্ষত স্থানে ওষুধ লাগিয়ে পানি পান করানো হলো।

বনহুর এদের সবাইকে উদ্ধার করে পৃথিবীর আলোতে নিয়ে এলো।

রাণী আর বনহুরের প্রচেষ্টায় ইটালীর ভয়াবহ ভূমিকম্পের ধসে পড়া ভূগর্ভস্থ হাজার হাজার মৃতপ্রায় লোক জীবন ফিরে পেলো কিন্তু ইটালী সরকার জানলো

না এরা কারা। ভিন্ন দেশীয় স্বেচ্ছাসেবক তারা, এটাই হলো তাদের পরিচয়।

বিপদ এলো বিদায় মুহূর্তে।

লোকটার নাম ছিলো মিঃ জিমস। তার প্রিয় স্ত্রীর নাম হলো মিসেস রীমুইনয়ারা। মিঃ জিমস মস্ত বড় ইন্ডাষ্ট্রীর মালিক ছিলো। ধনসম্পদের অভাব ছিলো না। স্ত্রী রীমু তার জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয় ছিলো, তাকে নিয়েই সে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতো। ঐ একুশতলা অট্টালিকায় বাস করতো তারা উভয়ে। তার অফিস ছিলো অন্যস্থানে।

ভূমিকম্পে স্বামী–স্ত্রী একই কক্ষে ছিলো না, কোনো কারণে স্বামী বাইরে যায় এবং একটু পর ফিরে আসে। ঠিক সেই মুহূর্তে ভূমিকম্প শুরু হয়, সেকি ভীষণ আর ভয়াবহ ভূমিকম্প।

কে কোথায় হারিয়ে যায় কেউ জানে না।

কত পিতামাতা সন্তানের একই সঙ্গে সমাধি রচিত হয়। কত স্বামী স্ত্রীকে হারায়, কত স্ত্রী স্বামীকে হারায়। ১৯৮০ তাদের জীবনকে তছনছ করে দিয়ে যায়।

অসুবিধা হলো মিঃ জিন্সকে নিয়ে।

সে রাণীকে মুহূর্তের জন্য ছাড়তে চায় না। হয়তো বা রাণী দেখতে তার হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী রীমুর মত।

বনহুর এলো হসপিটালে।

চলো রাণী, আমাদের কাজ শেষ, এবার আমাকে মণিষা দ্বীপে যেতে হবে।

কিন্তু……

বলো, থামলে কেন?

একটু বসো আমার পাশে……

তার মানে?

মানে একটু পরেই বুঝতে পারবে।

বেশ বসলাম।

বনহুর একটা চেয়ার টেনে বসলো।

রাণী তখন মিঃ জিমসের গায়ে চাদর ঠিক করে টেনে দিচ্ছিলো। যেমনি তার চাদর ঠিকভাবে গায়ে দিয়ে সরে যাবে রাণী, ঐ মুহূর্তে খপ করে মিঃ জিমস ধরে ফেললো রাণীর আঁচল।

বনহুর অবাক হলো কারণ সে তেমন কিছু জানে না। মিঃ জিমস বললো–আমাকে রেখে পালানো হচ্ছে বুঝি!

বললো রাণী–বনহুর, সব তোমাকে বলবো এখন তুমি যাও।

বনহুর বেরিয়ে এলো বাইরে। একটা সিগারেটে আগুন ধরিয়ে ধুমপান করে চললো, ভাবছে। জীর্ণ লোকটা কদিনে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার চেহারা মোটামুটি স্বাভাবিক হয়েছে কিন্তু ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছে না।

বনহুর ও রাণী যে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করেছিলো তাদের মধ্যে কয়েকজনের মৃত্যু ঘটেছে আর সবগুলো প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে। এতগুলো লোক সবই প্রাণ হারাতে যদি বনহুর তার বিস্ময়কর সুড়ঙ্গখনন মেশিনটা কৌশলে না আনতো। যাহোক রাণীও তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। তার সেবাযত্ন এবং সহয়োগিতার জন্য বনহুর সফল হলো সর্বতোভাবে।

একমুখ ধোয়া ছেড়ে ফিরে দাঁড়ালো বনহুর। এখনও রাণী এলো না, ব্যাপার কি?

ঠিক সেই মুহূর্তে এলো রাণী, তার চোখেমুখে হাসির আভাস লেগে রয়েছে কিন্তু সে হাসি ম্লান মনে হচ্ছে।

বললো বনহুর–কি ব্যাপার রাণী? রোগীর মধ্যে নতুন কোনো প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হলো বলে আমার মনে হলো।

সে অনেক কথা।

কি ধরনের?

কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।

চলো ওধারে গিয়ে বসি।

চলো।

রাণী আর বনহুর হসপিটালের নির্জন এক স্থানে এসে বসলো। রাণী মিঃ জিমসের ঘটনাটা সব বললো, কোনো কথা সে গোপন করলো না। বললো রাণী —-জানো বনহুর, মিঃ জিমস তার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ জানতে পারলে সেই মুহূর্তে হার্টফেল করবে–ডাক্তার লর্ড একথা বলেছেন। তুমি বুঝতেই পারছো মিঃ জিমস মনে করেছে তার রীমু আমি……

তাহলে ব্যাপারটা গুরুতর, আমি তার আচরণ দেখেই কিছুটা অনুধাবন করেছি।

এখন বলো আমি কি করবো?

তোমাকে এ অভিনয় করেই যেতে হবে যতদিন রোগী তার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে না পায়।

কিন্তু এটা কি সম্ভব?

আমি জানি রাণীর কাছে অসম্ভব কিছুই নয়। একটা জীবন বাঁচাতে গিয়ে তোমাকে কিছু কষ্ট করতেই হবে রাণী।

আমাকে এ দায়িত্ব পারন করতে…..কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো রাণী।

বনহুর হেসে বললো–রাণীর মন অভিনয়ে নুয়ে পড়বে না। তা ছাড়া মিঃ চৌধুরী কোনো দিনই তোমার প্রতি……

আমি জানি বনহুর। এ বিশ্বাস আমার আছে। মিঃ চৌধুরী এ মুহূর্তে আমাকে উৎসাহ যোগাতো, কারণ একটা জীবনের মূল্য সামান্য ত্যাগের চেয়ে অনেক বেশি।

তাহলে মনিষা দ্বীপ যাত্রা স্থগিত রাখা হলো?

লোকটা সুস্থ হয়ে উঠলেই আমরা মণিষা দ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করবো।

রাণী তোমার তুলনা হয় না।

বেশি বাড়িয়ে বলছ।

না, মোটেই না।

রাণী প্রসঙ্গটাকে অন্যপথে নেবার চেষ্টা করে। বললো সে–বনহুর ইটালীর কাজ তোমার শেষ হয়েছে।

ভূগর্ভে দেবে যাওয়া কক্ষগুলোর উদ্ধার কাজ শেষ হলেও এখনও বহু কাজ আছে তবে আমার জন্য নয়, কারণ মনীষা দ্বীপে তার চেয়েও বেশি কাজ রয়েছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। ইটালীর ভয়াবহ ভূমিকম্পের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় মণিষা দ্বীপের বন্যা। যদি যাও দেখবে সেখানে সর্ববৃহৎ বৃক্ষটার সুউচ্চ ডালে ঝুলছে কত বৃদ্ধের পরনের কাপড়, কত তরুণীর রঙিন শাড়ি। বন্যা হয়তো এখন মণিষা দ্বীপ থেকে নেমে সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু মণিষার সব সুখশান্তি ধুয়েমুছে নিয়ে গেছে।

রাণীর চোখ দুটো অশ্রু ছলছল হয়ে উঠলো।

কিছু বলতে যাচ্ছিলো সে।

ঐ সময় একটা গাড়ি এসে থামলো।

সবাই অবাক হয়ে তাকালো।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো বনহুর–রাণী দেখো কে এসেছেন।

[পরবর্তী বই মণিষা দ্বীপের গহ্বরে]